সেপ্টেম্বর ২০২৫ ■ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩২

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

বিজ্ঞানের জয়গান



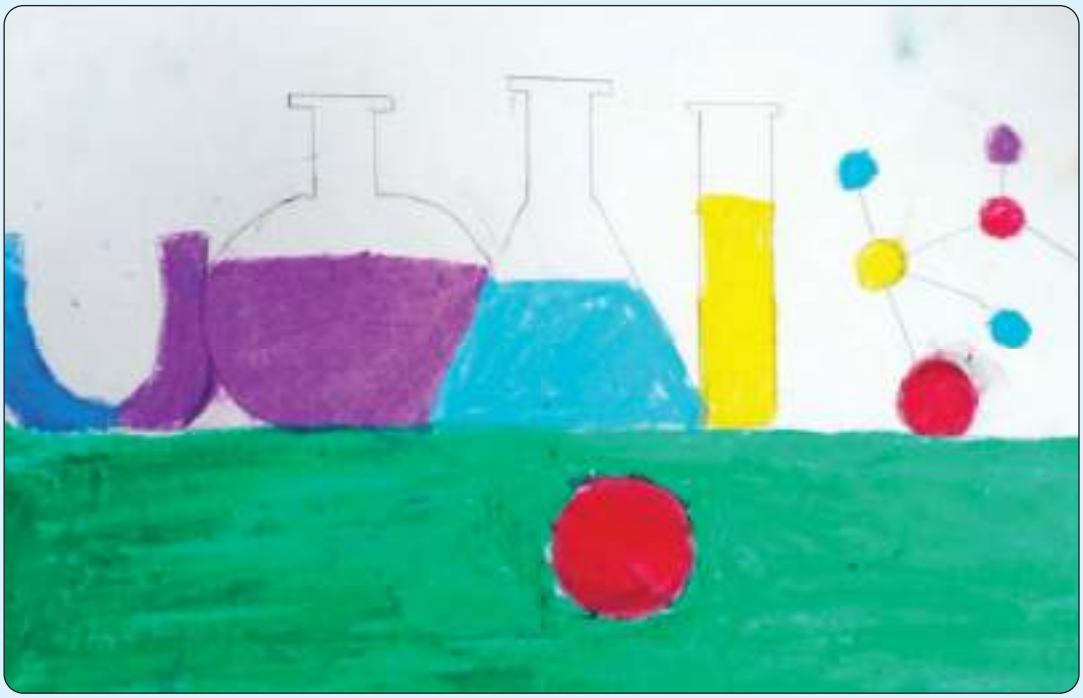

সামিহা হোসেন উম্মি, চতুর্থ শ্রেণি, বেঞ্চমার্ক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, টঙ্গী, গাজীপুর

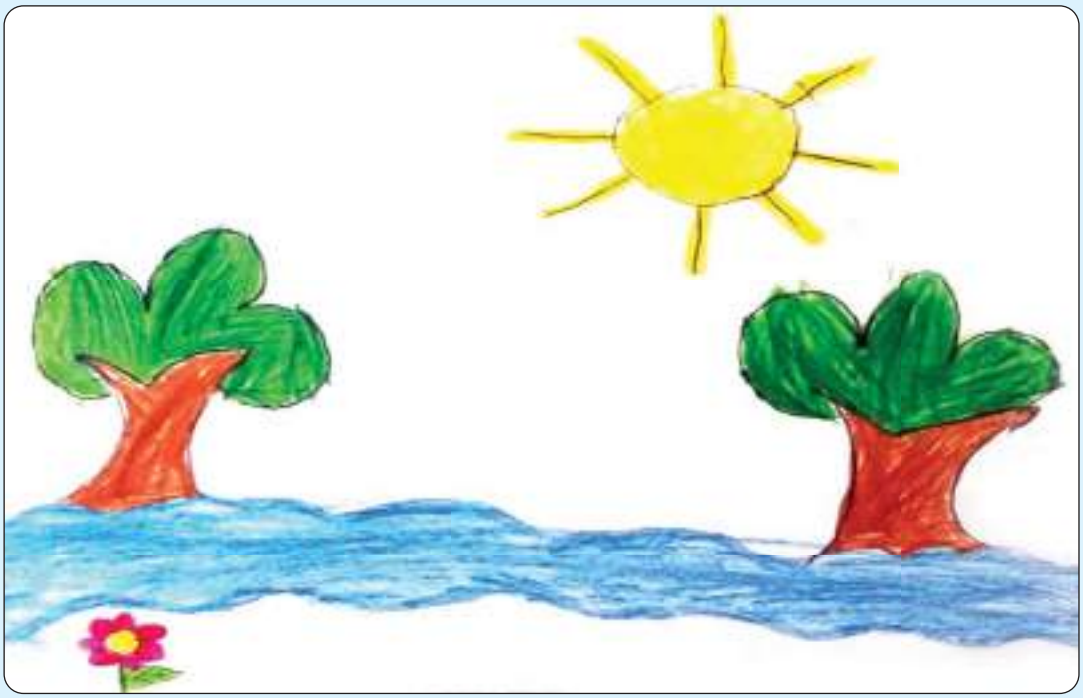

রাইসা আহমেদ সুবাহ, নার্সারি শ্রেণি, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

সম্পাদকীয়

আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞানের জয়-জয়কার। বিজ্ঞানের ব্যবহার জীবনকে সহজ ও গতিশীল করেছে। আজকাল ঘরে বসেই অনলাইনে নামি-দামি রেস্টুরেন্টে খাবার অর্ডার করা যায়। বাস, ট্রেন, প্লেনের টিকেট কাটা যায়। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে ক্যাশলেস কেনাকাটা ভ্রমণ করা যায়। কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ঘরে বসেই হোম পিকআপ ও হোম ডেলিভারি সিস্টেমের মাধ্যমে সেবা নেয়া যাচ্ছে এবং পণ্য পৌঁছে যাচ্ছে দেশে-বিদেশে সর্বত্র স্বল্পতম সময়ে। কুরিয়ারের ক্ষেত্রে পণ্যটি কোন পর্যায়ে আছে তাও সবসময় মনিটর করা যায়। টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে ঘরে বসেই ডাক্তারদের সেবা নেয়া যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। আবার ঘরে বসে বিদ্যুৎ বিলও পরিশোধ করা।

বন্ধুরা, তোমরা যেহেতু ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্ব দিবে, তাই তোমাদের বিজ্ঞান শিক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। বিজ্ঞানকে শুধু একটি বিষয় ভেবে ভয় পেলে চলবে না। বরং প্রাত্যাহিক জীবনের অপরিহার্য অংশ ভেবে বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করতে হবে। বিজ্ঞান চর্চা মানে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবনকে ভালোবাসা এবং রক্ষা করা ও প্রযুক্তিকে দায়িত্বশীলতার সাথে ব্যবহার করা। কারন বিজ্ঞান শিক্ষাই পারে কুসংস্কার দূর করে সত্য ও যুক্তির আলো ছড়াতে।

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
ই-মেইল :
editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
চৌধুরী সাহেলা পারভীন

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

সূচি

নিবন্ধ

৩ বিজ্ঞানের জয়গান/ তারিক মনজুর
৬ বিজ্ঞানের পথচলা/ মাহমুদুর রহমান
১১ সেরা বিজ্ঞানীদের কথা/ ইসমত আরা বেগম
১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিজ্ঞান ভাবনা/ এস ডি সুব্রত
৪১ মহাশূন্যের আহ্বান ভয়েজার-১/ শাহিনুর রহমান রিয়াদ
৪৩ বৃষ্টি তবে বৃষ্টি নয়.../ শাকিব হুসাইন
৪৫ ক্লাসিক্যাল বনাম কোয়ান্টাম কম্পিউটার/ মো. রাকিবুল ইসলাম

গল্প

১৭ পিকুসাইটস/নাসরীন মুস্তাফা
২০ ড্যাবলু, ট্যাবলু আর বিজ্ঞানী মামা/খায়রুল বাবুই
২৬ ষড়শৃঙ্গ কোঠা/দীপু মাহমুদ
৩১ রাতুলের বিজ্ঞান ঘর/আজহার মাহমুদ
৩৩ হুইসপার্স ইন দ্য রেইন/জুয়েল আশরাফ
৩৮ রোবো-সিংহ আর শিশুর দল/বিচিত্র কুমার
৪৭ কোডিং/হাসান আল শোয়াইব
৫০ এক্সপেরিমেন্ট রেইনবো/মিলাদ হোসেন সুজন
৫৪ মিমোসার 'মাংকি-ম্যান'/আশরাফ পিন্টু

প্রতিবেদন

৫৭ বায়োসিকিউরিটি ফেলোশিপ অর্জন মারজানা'র মেজবাউল হক
৫৯ শিশু-কিশোরদের যত্ন/ পুষ্টিবিদ লিনা আকতার
৬২ হারিয়ে গেল জোনাকি পোকা সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৬৩ বাংলাদেশের বিরল স্থান/শাহানা আফরোজ

কবিতাগুচ্ছ

২৫ আতিক রহমান/ গোলাম নবী পান্না/ ওমর ফারুক নাজমুল
৪২ মো. মারুফ বিল্লাহ/ মো. আফজাল হোসেন/ মাহবুবুর রহমান
৫৩ কোমল দাস
৫৬ নীহার মোশারফ/ মাহ্‌মূদ বিক্রম

ছোটোদের গল্প

৬১ ভাগ্যবান কৃষক/ওয়াহিদ মুস্তাফা

ছোটোদের ছড়া

৪২ মো. রুবায়েত আলম
৫৮ সুমাইয়া জান্নাত/ তৌফিক আলম

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : সামিহা হোসেন উম্মি/ রাইসা আহমেদ সুবাহ
তৃতীয় প্রচ্ছদ : মারিয়া আক্তার/ সুমাইয়া আক্তার মিম
শেষ প্রচ্ছদ : সিরাজুম মুনিরা বিভা
৪৯ বিন্দু রহমান
৬৪ সুহাইবা সেলিম/ তাসকিন আহমেদ হামীম

নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে

Nobarun Potrika

www.dfp.gov.bd



বিজ্ঞানের জয়গান

তারিক মনজুর

স্কুলে তুমি বিজ্ঞান পড়ো একটা বিষয় হিসেবে। হ্যাঁ, বিজ্ঞানকে তুমি পড়াশোনার একটা বিষয় বলতেই পারো। তবে 'বিজ্ঞান' যত না বিষয়, তার চেয়ে বেশি পদ্ধতি। প্রকৃতি আর সমাজকে পদ্ধতিগতভাবে পড়ার নাম বিজ্ঞান। বুঝতে কষ্ট হয়ে গেলো? সহজ করে বলি।

মনে করো, একটা ফল গাছে থাকলে পেকে যায়। পাকার পর সেই ফল দেখতে হলুদ হয়। আর খেতেও খুব মিষ্টি হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ফল গাছে থাকলে পাকে কেন? তুমি প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নিলে, গরমের কারণে গাছের ফল পাকে। এখন গাছ থেকে একটা কাঁচা ফল পেড়ে চুলার পাশে রেখে দিলে, কিন্তু কিছুদিন পর দেখলে ফলটা পচে গেছে। তাহলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এলে, গরমের কারণে ফল পাকে এটা ঠিক নয়। তুমি যুক্তি হিসেবে পাশে আরো কিছু বিষয় দাঁড় করাতে পারো। যেমন, শীতকালেও তো গাছের ফল পাকে। তার মানে, পাকার সাথে গরমের বা তাপের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই।

এই যে পদ্ধতিগতভাবে কাজ করা, এর নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞান পরীক্ষা করে দেখেছে, গাছ নিজে নিজেই একধরনের হরমোন তৈরি করে। সেটা ফলকে লক্ষ্য করেই তৈরি হয়। সেই বিশেষ হরমোন ফল পাকায়। বিজ্ঞানীরা হরমোনটার নাম দিয়েছেন ইথানল। এখন ইথানল মানুষ নিজেও তৈরি করতে শিখে গেছে। কাঁচা ফল পেড়ে তাতে ইথানল দিয়ে পাকানো যায়।

বিজ্ঞানকে অন্যভাবে বলা যেতে পারে, যেমন- পদ্ধতিগত গবেষণা। কোনো একটি ধারণা সত্য কি না, তা পরীক্ষা বা গবেষণা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আবার, পরীক্ষা করে পাওয়া সব সিদ্ধান্তই যে ঠিক হবে, তা কিন্তু নয়। বিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধান্ত পরে বদলে গেছে।

বিজ্ঞানের শাখা

বিজ্ঞানের অনেক শাখা। যেমন একটি শাখার নাম পদার্থবিজ্ঞান। এই শাখা পদার্থ আর শক্তি নিয়ে কাজ করে। ক্ষুদ্র বস্তকণা থেকে শুরু করে বৃহৎ মহাজাগতিক উপাদান কীভাবে কাজ করে কিংবা একে অপরকে প্রভাবিত করে, পদার্থবিজ্ঞানে সেই গবেষণা করা হয়। আবার আরেক শাখার নাম রসায়নবিজ্ঞান। পদার্থের মধ্যে থাকা উপাদানের পরিমাণ, গঠন নিয়ে রসায়ন কাজ করে। এক উপাদানের সাথে অন্য উপাদানের বিক্রিয়ায় কী রূপান্তর ঘটে, সেটিও সেখানে দেখা হয়। জীববিজ্ঞান আরেকটি প্রধান শাখা। জীবিত উপকরণের গঠন, কাজ, বৃদ্ধি, রূপান্তর এসব নিয়ে এই শাখা কাজ করে। এর আবার দুটি উপশাখা রয়েছে – প্রাণীবিজ্ঞান আর উদ্ভিদবিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের এক শাখা থেকে এভাবে বহু শাখা তৈরির নজির আছে। আগে যেমন মানুষের ইতিহাসে ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক ঘটনা সবই পাঠ করা হতো। এগুলো এখন ভাষাবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি অনেকগুলো ভাগে আলাদা হয়েছে। আবার পরে ভাষাবিজ্ঞানেরও নতুন নতুন শাখা হয়েছে; যেমন – সমাজভাষাবিজ্ঞান, ধ্বনিবিজ্ঞান, প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি। প্রত্যেকটি শাখা ধীরে ধীরে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। পরে এই শাখা থেকে নতুন শাখা তৈরি হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

বিজ্ঞান ছাড়া কি পৃথিবী অচল

তোমার মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হতে পারে, বিজ্ঞান ছাড়া পৃথিবী অচল কি না। সহজ কথায়, হ্যাঁ। আসলে আদিকালের মানুষও বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে জীবন চালিয়েছে। যেমন ধরো, আগের দিনে মানুষ পশু শিকার করত। কোন পাথর ছুঁড়ে সহজেই পশুটাকে ঘায়েল করা যাবে, তাকে প্রাথমিকভাবে ধারণা করতে হয়েছে। সে হয়ত ভেবেছে, ভারী পাথর দিয়ে সহজেই পশুকে ঘায়েল করা যায়। কিন্তু সেই পাথর তার পক্ষে তোলা সম্ভব নাও হতে পারে। এমনকি ভারী একটা পাথর নিয়ে পশুর পিছন পিছন ধাওয়া করাও কঠিন। তাই হাতে ধরার মতো হালকা পাথর তাকে নিতে হয়েছে। আর এই পাথরকে তীক্ষ্ণ বা ধারালো করে পশু শিকারের উপযোগী করতে হয়েছে।



সব কাজের মধ্যেই এভাবে প্রকারান্তরে বিজ্ঞান লুকিয়ে থাকে। আমরা বিষয় হিসেবে বিজ্ঞান পড়ি, যাতে ঠিকমতো বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো যায়। বিজ্ঞান বই পুরনো ধারণাগুলোকে আমাদের সামনে হাজির করে। যেমন- নিউটন বলে গেছেন, প্রত্যেক বস্তুরই একটি সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া থাকে। এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে পরে রকেট আবিষ্কার করা হয়। নিউটন মারা গেছেন ১৭২৭ সালে। আর রকেট আবিষ্কার হয় ১৯২৬ সালে। পিছন দিক থেকে প্রবল বেগে জ্বালানি বের করে দেওয়া হয়, আর রকেট সমান গতিতে সামনে এগিয়ে যায়।

বিজ্ঞানের দরকারি আবিষ্কার

বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে অবশ্য অনেকে উদ্ভাবন বলতে চান। নতুন করে যা তৈরি হয়, তাকে বলে উদ্ভাবন। যেমন মানুষ বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবন করেছে, টেলিভিশন উদ্ভাবন করেছে, গাছের প্রাণ আছে এটা উদ্ভাবন করেছে। আর যা আগে থেকেই ছিল, মানুষ সেটার খোঁজ পেয়েছে মাত্র, তাকে বলে আবিষ্কার। যেমন, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। আমেরিকা আগে থেকেই ছিল; কলম্বাস সেটির খোঁজ পেয়েছেন। তাই বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক আসলে উদ্ভাবনের।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ অনেক কিছু উদ্ভাবন করেছে। মানুষের অপরিমেয় কৌতূহল আর আগ্রহ তাকে উদ্ভাবক বানিয়েছে। টমাস আলভা এডিসনের নাম অনেকেই জানো। তিনি বৈদ্যুতিক বাতি থেকে শুরু করে এক হাজারের বেশি জিনিস উদ্ভাবন করেন। অথচ স্কুলে তিনি পরিচিত ছিলেন 'গাধা ছাত্র' হিসেবে।



এতই বোকা আর গাধা ছিলেন যে, স্কুল থেকে তাঁকে বের করে দেওয়া হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়ে জানায়, এত দুর্বল শিক্ষার্থীকে তারা স্কুলে রাখবে না। এডিসনের মা এরপর ছেলেকে ঘরেই পড়াতেন। বালক এডিসন যখন জানতে চাইতেন তাকে কেন স্কুলে নেওয়া হচ্ছে না, তার মা বলতেন, তুমি এত মেধাবী যে তোমাকে পড়ানোর মতো কোনো শিক্ষক স্কুলে নেই। এই মিথ্যা প্রবোধ এডিসনকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল।

বিজ্ঞানের সব উদ্ভাবন কি হয়ে গেছে

ছেলেবেলায় অনেকেই মনে করে, বিজ্ঞানের সব উদ্ভাবন বুঝি হয়ে গেছে। ব্যাপারটা মোটেই যে তা নয়, কিছুদিন বাদে ঠিক বুঝতে পারে। বিজ্ঞান বর্তমানে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নতুন নতুন উদ্ভাবনের কাজ করে যাচ্ছে। পুরনো উদ্ভাবনের দ্রুত রূপান্তর ঘটছে। যেমন, মোবাইল ফোনের কথাই ভাবো। টমাস এডিসন তার দিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে শব্দ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে গ্রাহামবেল তার দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কথা পাঠানোর উপায় বের করেন। তারের টেলিফোন বহু বছর পৃথিবীর যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে থেকেছে। পরে তারহীন মোবাইল উদ্ভাবন হয়। এই মোবাইলের আরো কত রূপান্তর যে গত দুই দশকে হয়েছে, ভাবা যায় না। ভবিষ্যতে যোগাযোগের জন্য হাতে মোবাইল ধরে রাখারও প্রয়োজন হবে না। বিজ্ঞান এখন ঘরের কাছের জীবকণা নিয়ে যেমন কাজ করছে, তেমনি বিশাল সৌরজগতের দূর অজানা গ্রহ-গ্রহাণু নিয়েও কাজ করছে।

তুমিও বিজ্ঞানী হয়ে উঠতে পারো

তোমারও সুযোগ রয়েছে বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার। তুমি যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেবে, সেখানে যুক্তি আর বুদ্ধি খাটাবে। তাহলেই হবে। যেমন, বইয়ের ভিতরে ফুলের পাপড়ি রাখলে তা শুকিয়ে পাতলা হয়ে যায় কেন। প্রাথমিকভাবে এর একটি কার্যকারণ ধরে নাও। সেটি সত্য কি না যাচাই করে দেখো। পাপড়ি কেন পানি হারায় আর পাতলা হয়ে যায়, তার যথার্থ কারণ যদি বের করতে নাও পারো, সমস্যা নেই। তোমার পদ্ধতি যদি অনুসন্ধানের হয়, তবে তোমাকেও বিজ্ঞানী বলা যাবে। বিজ্ঞানী শুধু নতুন নতুন উদ্ভাবন করেন না, বিজ্ঞানী বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন, কিংবা তাঁর কাজের পদ্ধতি হয় বিজ্ঞান।

পৃথিবী যতদিন থাকবে, বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ আর গবেষণা চলতে থাকবে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখারও উদ্ভব হতে থাকবে। তোমার বাংলা, সমাজ এসব বিষয়ও যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো। যে কোনো কিছু পড়ার সময়ে সরাসরি সেটিকে সত্য বলে মেনে নিতেই হবে, এমন নয়। তোমার মনে তৈরি হওয়া প্রশ্নের জবাব খুঁজতে থাকো। তাহলেই তোমার অনুসন্ধিৎসু মন বিজ্ঞানী হয়ে উঠবে। ❑

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



বিজ্ঞানের পথচলা

মাহমুদুর রহমান

আদিম যুগের একদল মানুষ। ঘুরে বেড়ায় বনে-জঙ্গলে। খাবারের খোঁজে। খাবার বলতে গাছের ফলমূল। হাতিয়ার কী ওরা জানে না। জানে না আগুনের ব্যবহার। বজ্রপাতের ঝলক, দাবানলে ছারখার হওয়া জঙ্গলের আগুন কাঁপন ধরিয়ে দেয় তাদের বুকে। সেই মানুষগুলোই একসময় গাছের ডাল কিংবা পশুর হাড় হাতে তুলে নেয়। বন্য প্রাণীদের সঙ্গে লড়াই করতে মানুষের সে-ই প্রথম প্রচেষ্টা। এরপর তারা পাথর ছুড়ে দূর থেকেই শত্রুর মোকাবিলা করতে শেখে, লাঠি কিংবা হাড় ব্যবহার করে সেটা সম্ভব ছিল না। সেই পাথরই আবার কাজে লাগল বন্য পশু মারতে, আগুন জ্বালাতে। পাথর আর আগুনের ব্যবহার— বিজ্ঞানের পথে মানুষের সেই প্রথম পদযাত্রা। এরপর মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখেছে, পশু পালনে অভ্যস্ত হয়েছে, নিপুণ শিল্প আত্মস্থ করে শিখেছে মাটির পাত্রের ব্যবহার। ধীরে ধীরে কারিগরি দক্ষতা বেড়েছে। ভাষা শিখেছে মানুষ। নিজেকে উদ্ভাসিত করেছে সভ্যতার আলোয়।

বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষ গড়েছে মিসরীয়, ব্যাবিলনীয়, চৈনিক, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা। এসব সভ্যতায় মানুষ প্রযুক্তিগতভাবে যতটা এগিয়েছে, ততটাই শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলায় গড়ে উঠেছে নগরকেন্দ্রিক সমাজ। বর্তমান বিজ্ঞান ও সভ্যতার যাত্রা শুরু হয় গ্রিক দেশ থেকে। রোমানরা গ্রিক বিজ্ঞানের ওপর দাঁড়িয়ে মজবুত করেছে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত। মধ্যযুগে হয়েছে ইউরোপে রেনেসাঁ। ঠিক তারপরেই কোপার্নিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন— মহান এই মানুষগুলোর হাত ধরে প্রবল হাওয়া লাগে বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতার পালে। আর পিছু ফিরতে হয়নি মানবজাতিকে। গণিত আর বিজ্ঞানের পাশাপাশি প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগতে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনে। এর পরই তো শিল্পবিপ্লব। আমূল বদলে দেয় পৃথিবীকে। ঊনবিংশ ও বিংশ

শতাব্দীতে দুর্বার গতিতে ছুটে চলে মানবসভ্যতা। সেই গতিই আবার পালটা গতি দান করে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে। পদার্থ, রসায়ন, মহাকাশ, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র- সর্বত্র পতপত করে উড়ছে বিজ্ঞানের জয়ের পতাকা।

ইতিহাস

বিজ্ঞানের ইতিহাস এমন ধরনের ঐতিহাসিক নিদর্শন যা যুগে যুগে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিস্তার লাভ করেছে এবং যার ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থেকেছে সবসময়। বিজ্ঞান কখনোও থেমে থাকেনি বরং এগিয়েছে। বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বিজ্ঞানের সূচনা মানব জন্মের শুরু থেকেই পার্থক্য এই যে, সে সময় মানুষ জানত না যে সে কি করেছে বা কোন সভ্যতার সূচনা ঘটতে চলেছে তার মাধ্যমে। তারপর একসময় মানুষ তার কাজের অর্থ ও গুরুত্ব বুঝতে পারল তখন সে তার কাজগুলোকে গুছিয়ে আনার চেষ্টা করল। যুগে যুগে বিজ্ঞান কীভাবে এগিয়ে গেছে তার ছোট্ট বর্ণনা তুলে ধরলাম-

প্রাগৈতিহাসিক যুগঃ মানুষ প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে (সূর্য, চাঁদ, ঋতু) জ্ঞান অর্জন শুরু করে, যা বিজ্ঞানচর্চার ভিত্তি স্থাপন করে।

প্রাচীন সভ্যতা মিশর, ব্যাবিলন, ভারত, চীনঃ জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিত, চিকিৎসা এবং দর্শন নিয়ে কাজ শুরু হয়।

ধ্রুপদী প্রাচীনত্বঃ অ্যারিস্টটল, প্লেটো প্রমুখ যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও প্রদর্শনের কৌশল দিয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ভিত্তি মজবুত করেন।

মধ্যযুগঃ ইউরোপে 'অন্ধকার যুগ' এলেও, আরব, চীন ও ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চা অব্যাহত ছিল।

রেনেসাঁস ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লবঃ গ্যালিলিও, নিউটনের মতো বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গণিতের মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন।

আধুনিক যুগঃ বিজ্ঞান একটি আনুষ্ঠানিক শৃঙ্খলায় পরিণত হয় এবং প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক এই তিনটি প্রধান শাখায় বিকাশ লাভ করে।

মূলত বিজ্ঞানের কোনো একক উৎস নেই, এটি একটি ধীর ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী এবং তার আবিষ্কার

পৃথিবীর সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী কে ছিলেন এবং তার প্রথম আবিষ্কার কী ছিল?' এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া একটু কঠিন কারণ 'বিজ্ঞান' শব্দটির সংজ্ঞা যুগে যুগে

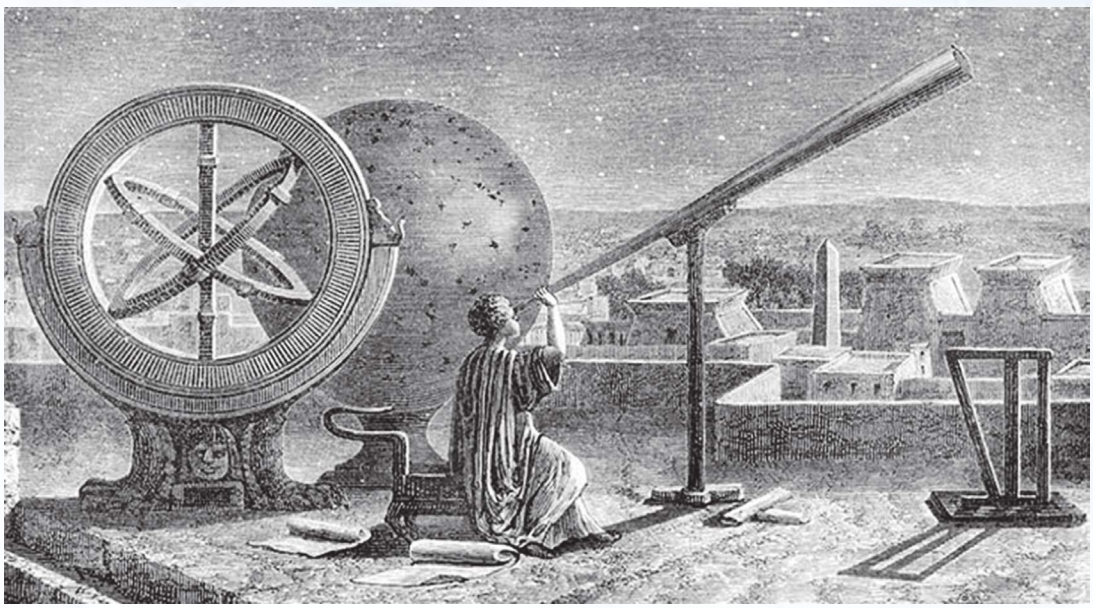

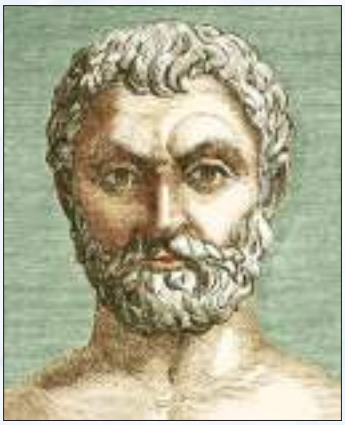

থ্যালিজ

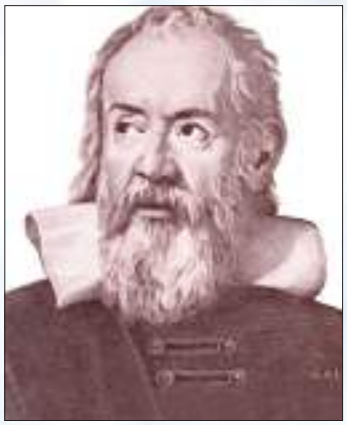

গ্যালিলিও গ্যালিলি



ইবনে আল-হাইথাম

বদলেছে। তবে, থ্যালিজ নামক গ্রিক দার্শনিককে পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞানী বলে মনে করা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৫ অব্দে জন্মগ্রহণ করে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০ অব্দে মারা যান তিনি। তাঁকে পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞানী বলা হয় কারণ তিনি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোকে দেবতাদের কারসাজি না ভেবে, বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন।

থ্যালিজের কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান

* **সূর্যগ্রহণের পূর্বাভাস:** খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৫ সালে তিনি একটি সূর্যগ্রহণের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন এবং তার পূর্বাভাস সঠিক হয়েছিল।
* **জ্যামিতি:** তিনি মিশরে গিয়ে জ্যামিতি শিখেছিলেন এবং পিরামিডের উচ্চতা মাপার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন।
* **চুম্বকত্ব:** তিনি লোহার কণা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় এমন ঘটনা লক্ষ্য করেছিলেন।

থ্যালিজের আগেও অনেকেই বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে গবেষণা করেছেন সেই সাথে প্রাচীন মিশরীয়রা জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছিল। সুতরাং, সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী কে ছিলেন, সেটা নির্ধারণ করা একটু কঠিন। তবে থ্যালিজকে প্রাচীন গ্রিসে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পথিকৃত বলে মনে করা হয়। এছাড়া অনেকে গ্যালিলিও গ্যালিলি বা ইবনে আল-হাইথাম-কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচনা করেন, যারা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। এসব ব্যক্তিরা আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

প্রথম আবিষ্কার

বিজ্ঞানের প্রথম আবিষ্কার নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন, কারণ এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। মানবজাতির প্রথম দিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক/প্রযুক্তিগত আবিষ্কারগুলোর মধ্যে একটি হলো আগুন জ্বালানোর কৌশল (পাথরে পাথর ঘষে বা অন্য উপায়ে) যা প্রাচীন মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে ও বিকাশে মৌলিক ভূমিকা রাখে। যদিও এটি কোনো একক ব্যক্তির একক আবিষ্কার ছিল না। সুতরাং, আগুন জ্বালানো মানব সভ্যতার প্রথম দিকের একটি মৌলিক আবিষ্কার।

আরো কিছু প্রাথমিক আবিষ্কার

চাকা: পরিবহণ ও যন্ত্রপাতি তৈরিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে।

কৃষি: যা মানব বসতি ও সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে।

লেখার পদ্ধতি: তথ্য সংরক্ষণ ও জ্ঞান বিতরণে সহায়তা করে।

সূর্যঘড়ি: সময় পরিমাপের প্রথম প্রচেষ্টা, যা প্রাচীন মিশরীয়রা শুরু করেছিল।

যুগে যুগে বিজ্ঞান আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস উপহার দিয়েছে। বিজ্ঞান এমন হাজারেরও বেশি

আবিষ্কার আমাদের উপহার দিয়েছে যা ছাড়া এখন আমাদের জীবন কল্পনাই করা যায় না। আবার কোনো কোনো আবিষ্কার বিজ্ঞানে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

ইতিহাসের সেরা আবিষ্কার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষে সহজ হয়েছে মানুষের জীবনযাপন। আর এর অধিকাংশ নির্ভরশীল বিদ্যুতের ওপর। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ইতিহাস পুরোপুরি স্পষ্ট না হলেও ব্রিটিশ বিজ্ঞানী উইলিয়াম গিলবার্টকে বলা হয় বিদ্যুতের আবিষ্কারক। তিনি ১৫৭০ সালে প্রথম বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেন। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরো বেশ কিছু বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম- আলেসান্দ্রো ভোল্টা, লইগি গ্যালভানি, মাইকেল ফ্যারাডে ও থমাস আলভা এডিসন। তারা প্রত্যেকেই বিদ্যুতের বিভিন্ন দিক উদ্ভাবন করেছেন। তবে বিদ্যুৎ আবিষ্কারে সবচেয়ে বড়ো অবদান রাখেন থমাস আলভা এডিসন। তার বৈদ্যুতিক বাতির আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় বিদ্যুতের আবিষ্কার। ১৮৮২ সালে এডিসনই প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্টেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তবে বিদ্যুতের ওপর গবেষণা শুরু হয় ১৬ শতকের দিকে। ১৮ শতকের মাঝামাঝি আমেরিকান বিজ্ঞানী বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রথম বিদ্যুতের ওপর ব্যবহারিক গবেষণা শুরু করেন। কিন্তু এ সময় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়া যেত না। শুধু সাময়িক সময়ের জন্যই বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যেত। ১৮৪০ সালে আবিষ্কৃত টেলিগ্রাফও ব্যাটারির মাধ্যমে চালানো হতো। এরই মাঝে ফ্যারাডের একটি আবিষ্কারের সূত্র ধরেই ১৮৩১ সালে ডায়নামো আবিষ্কার করা হয়। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পর সভ্যতা এগিয়ে যাওয়ার সব সরঞ্জাম হাতের নাগালে পাওয়া যায়। পৃথিবীর সব প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পেছনেই এক নম্বর অবস্থানে আছে বিদ্যুৎ। তাই বিদ্যুৎকে বলা হয় আধুনিক পৃথিবীর সেরা আবিষ্কার।

বিংশ শতাব্দীর সেরা দশ আবিষ্কার

কোনো ধরনের সন্দেহ ছাড়াই এ কথা বলা চলে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসে অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে বিংশ শতাব্দীর গুরুত্বটা একটু বেশি। এ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়েছে এমন অনেক কিছু, যা



ব্রিটিশ বিজ্ঞানী উইলিয়াম গিলবার্ট

মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। নির্দিষ্ট করে বিংশ শতাব্দীর সেরা দশ আবিষ্কারের কথা বলা কঠিন। কারণ, আবিষ্কৃত প্রতিটি জিনিসের রয়েছে আলাদা ব্যবহার, পৃথক মূল্য, ভিন্ন প্রভাব ইত্যাদি। নানাবিধ বিষয় বিবেচনায় এনে বিংশ শতাব্দীর যে ১০টি আবিষ্কার মানুষের জীবনকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক- যে-কোনোভাবে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তার একটি সম্ভাব্য তালিকা এখানে দেওয়া হলো।

রেডিও: কোনো ব্যক্তি হাজার মাইল দূরের অন্য কোনো ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন কোনো ধরনের তারের সাহায্য ছাড়াই। তখন এর প্রভাব কেমন ছিল আজকের পৃথিবীর খুব কম মানুষই উপলব্ধি করতে পারেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীনসহ একটা লম্বা সময়ে পারিবারিক জীবনে রেডিও অন্য রকম একটা স্থান ধরে রাখে।



টেলিভিশন: বিংশ শতাব্দীতে রেডিওর পরে মানুষ বিনোদনের জন্য টেলিভিশনের ওপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শিক্ষা, সংবাদসহ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রেও টেলিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

ইন্টারনেট: পুরো পৃথিবীটাকেই এক রকম হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে এই ইন্টারনেট। এর বদৌলতেই এক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্তের খবর পৌঁছে যাচ্ছে আরেক প্রান্তে।

অ্যান্টিবায়োটিক: এ শতাব্দীর আরেকটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো অ্যান্টিবায়োটিক। ১৯২৮ সালে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। এ আবিষ্কারের ফলে শরীরে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণজনিত মৃত্যুহার কমিয়ে আনতে সফল হন বিজ্ঞানীরা।

সাবমেরিন: প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮৮০ সালে। কিন্তু আধুনিক সাবমেরিন যাত্রা শুরু করে বিংশ শতাব্দীতে এসে।

রকেট: মানুষকে চাঁদে পা রাখার সুযোগ করে দিয়েছে রকেট। এটা আবিষ্কার না হলে আজো হয়তো মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা সম্ভব হতো না।

মোটরগাড়ি: সেরা ১০ আবিষ্কারে মোটরগাড়ির অবস্থান সপ্তম। মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনে দেয়।

উড়োজাহাজ: বিংশ শতাব্দীতেই মানুষ প্রথম উড়তে শেখে। উড়োজাহাজ আবিষ্কারের মাধ্যমে একেবারে অল্প সময়ে দূর-দূরান্তে ভ্রমণ সম্ভব হয় এ শতাব্দী থেকেই।

কম্পিউটার: বর্তমান যুগে কম্পিউটার ছাড়া চলাটা এক রকম অসম্ভবই হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও কম্পিউটার ছিল; কিন্তু তখন তা ছিল আকারে বেশ বড়ো এবং অত্যন্ত মূল্যবান। ১৯৭৬ সালে বাজারে অ্যাপলের কম্পিউটার আসার পর থেকে পরিস্থিতি পালটাতে শুরু করে।

পারমাণবিক শক্তি: এ আবিষ্কার মানুষের মঙ্গলে যতটা সক্ষম, ততটাই সক্ষম সভ্যতাকে ধ্বংস করতে। যার প্রমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দেখিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে মাত্র দুটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে প্রাণ হারায় লাখো মানুষ। পারমাণবিক শক্তি বিংশ শতাব্দীর এমন এক আবিষ্কার, যা সঠিক ব্যবহারে যেমন হয়ে উঠতে পারে শক্তির অসাধারণ এক উৎস আবার ভুল ব্যবহারের কারণে সারা পৃথিবীর জন্য হয়ে উঠতে পারে তা ধ্বংসের একমাত্র কারণ।

বিজ্ঞানের ইতিহাস শুধু আবিষ্কারের তালিকা দীর্ঘ নয় বরং এটি প্রকৃতিকে বুঝার নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি ❑

প্রাবন্ধিক

সেরা বিজ্ঞানীদের কথা

ইসমত আরা বেগম

বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অনেক দেশের অনেক বিজ্ঞানী রয়েছেন, যারা নিজেদের আবিষ্কার ও তত্ত্ব দিয়ে পৃথিবী ও সভ্যতাকে আলোকিত করেছেন। তাদের মাঝে সেরা কয়েকজনের আবিষ্কার ও অবদান সম্পর্কে জানা যাক-

আইজ্যাক নিউটন (১৬৪৩-১৭২৭): স্যার আইজ্যাক নিউটনকে বলা হয় সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানী। তিনি



ছিলেন একইসাথে পদার্থবিদ, গণিত বিশারদ, জ্যোতির্বিদ, ধর্মতত্ত্ববিদ এবং লেখক। ইংল্যান্ডে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের অগ্রপথিক ছিলেন তিনি। বিজ্ঞানে তাঁর সেরা অবদান হিসেবে দেখা হয়, গতিবিদ্যার তিন সূত্র ও ফাউন্ডেশন অব ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিক্সকে। তিনি মহাবিশ্বের শক্তি হিসেবে মহাকর্ষীয় শক্তির জন্য একটি সূত্র তৈরি করেন। পাশাপাশি আবিষ্কার করেছেন বিখ্যাত বায়োনমিয়াল থিওরোম। ইনফেনিটেস্টিমাল ক্যালকুলাসের জন্যও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। নিউটনের প্রিন্সিপিয়াকে বিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রন্থগুলোর অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আলবার্ট আইনস্টাইন (১৬৭৯-১৯৫৫): থিওরি অব রিলেটিভিটির জন্য আলবার্ট আইনস্টাইন বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনন্য অবস্থান দখল করে আছেন। এই জার্মান বিজ্ঞানী একজন বিশ্ববিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ। ইকুয়াভ্যারেন্স অব মেটার ও এনার্জি'র থিওরি দিয়ে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। এছাড়া আপেক্ষিক তত্ত্ব,

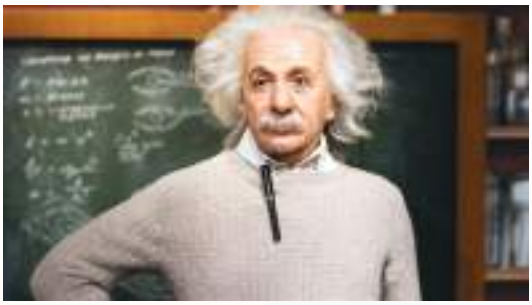

ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট, ব্রাউনিয়ান গতি কসমোলজি থার্মোডাইনামিক্স নিয়েও তাৎপর্যপূর্ণ কাজ করেছেন এই মহান বিজ্ঞানী। নোবেল বিজয়ী এই বিজ্ঞানী চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর বিখ্যাত $E=mc^2$ সূত্রের জন্য।

নিকোলা টেসলা (১৮৫৬-১৯৪৩): সার্বিয়ান-আমেরিকান বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক নিকোলা টেসলা। ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার, পদার্থবিদ ও মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবেও তিনি বিশ্ববিখ্যাত। নিকোলা টেসলা বহুমুখী এসি বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার (Polyphase AC electric power system) ডিজাইন করেন, যা বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৮৯১ সালে টেসলা কয়েল আবিষ্কার করেন, যা উচ্চ ভোল্টেজ তৈরি করে। এছাড়া তিনি



রেডিও প্রযুক্তি এবং তারবিহীন যোগাযোগের ভিত্তি স্থাপন করেন এছাড়াও তিনি সাধারণ বাল্বের চেয়ে ভিন্ন ধরনের আলো তৈরি করার পদ্ধতি, রোবট, রিমোট কন্ট্রোল, রাডার প্রযুক্তির ভিত্তি, টেসলা টারবাইন, এবং বিদ্যুৎ-সম্পর্কিত অন্যান্য অনেক পেটেন্ট (প্রায় ২০০টি) আবিষ্কার করেছেন।

গ্যালিলিও গ্যালিলেই (১৫৬৪-১৬৪২): একজন ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ



এবং দার্শনিক যিনি বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সঙ্গে বেশ নিগূঢ়ভাবে সম্পৃক্ত। তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে রয়েছে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি সাধন যা জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া নিউটনের গতির প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্র, কোপারনিকাসের মতবাদের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল তাঁর। বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক, পদার্থ বিজ্ঞানের জনক এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানের জনক হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

লুই পাস্তর (১৮২২-১৮৯৫): তিনিই প্রথম দেখান যে রোগজীবাণু বা অণুজীবই বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে, যা তখনকার প্রচলিত ধারণার বিপরীত ছিল। এছাড়া



দুধকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গরম করে দ্রুত ঠান্ডা করলে ক্ষতিকর অণুজীব ধ্বংস হয়, এই প্রক্রিয়াটি তাঁর নামেই নামকরণ করা হয়েছে। বিজ্ঞানে তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান অ্যানথ্রাক্স (Anthrax) এবং জলাতঙ্ক (Rabies)-এর মতো মারাত্মক রোগের টিকা আবিষ্কার, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে।

আল-বেরুনি (আনুমানিক ৯৭৩- আনুমানিক ১০৫৩): আবু রায়হান মোহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-বেরুনি ছিলেন মধ্যযুগের বিশ্বখ্যাত আরবীয় শিক্ষাবিদ ও গবেষক। তিনি অত্যন্ত মৌলিক ও গভীর চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। তিনি গণিত, জ্যোতিঃপদার্থবিদ, রসায়ন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পারদর্শী। এছাড়া ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক, পঞ্জিকাবিদ, দার্শনিক এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ববিদ ও ধর্মতত্ত্বের নিরপেক্ষ বিশ্লেষক। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্ধ ও পঞ্চম



শতাব্দীর প্রথমার্ধকে আল-বেরুনির কাল বলে উল্লেখ করা হয়। তিনি সর্বপ্রথম প্রাচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞান, বিশেষ করে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।



আবদুস সালাম (১৯২৬-১৯৯১): ১৯৭৯ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল বিজয়ী, প্রথম মুসলিম ও পাকিস্তানি হিসেবে এই সম্মান পান আবদুস সালাম। এছাড়া তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

ড. আবদুল কাদির খান (Dr. Abdul Qadeer Khan): পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচির জনক হিসেবে পরিচিত, এছাড়া তিনি একজন বিখ্যাত পারমাণবিক পদার্থবিদ ও ধাতুবিদ্যা প্রকৌশলী।



ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭): ইবনে সিনা ছিলেন একজন পারসিক মুসলিম বহুবিদ্যা বিশারদ। তাঁর



পুরো নাম আবু আলি হুসাইন বিন আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান বিন আলী ইবনে সিনা। আরবি ভাষায় তাঁকে ইসলামি স্বর্ণযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, চিন্তক, লেখক এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক গণ্য করা হয়।

জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭): তিনি প্রমাণ করেন যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে ও তারা উত্তেজনায় সাড়া দেয়, যার জন্য তিনি ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph) নামক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তিনি বেতার যোগাযোগে (Wireless Communication) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, যা আজকের রেডিও ও ওয়াই-ফাই প্রযুক্তির ভিত্তি স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি বাংলা কল্পবিজ্ঞানের জনক হিসেবেও পরিচিত।



মেরি কুরি (১৮৬৭-১৯৩৪) : প্রথম নারী বিজ্ঞানী মেরি কুরি যিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই পোলীয় ও ফরাসি বিজ্ঞানী ১৯০৩ সালে



তেজস্ক্রিয়তার উপর গবেষণার জন্য তার স্বামী পিয়ের ক্যুরি এবং তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কারক অঁরি বেকেরেলের সাথে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী যিনি বিজ্ঞানের দুইটি ভিন্ন শাখায় দুইবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রথম নারী অধ্যাপক ছিলেন।

বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে করেছে উন্নত ও সমৃদ্ধ। এটি আমাদের সমস্যার সামাধানের পথ দেখায় এবং নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরাও তাদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের প্রমাণ করেছেন। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর মতো কিংবদন্তী থেকে শুরু করে আধুনিক সময়ের গবেষকগণ সকলেরই অবদান এই দেশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে নিয়ে যচ্ছে। ❑

প্রাবন্ধিক

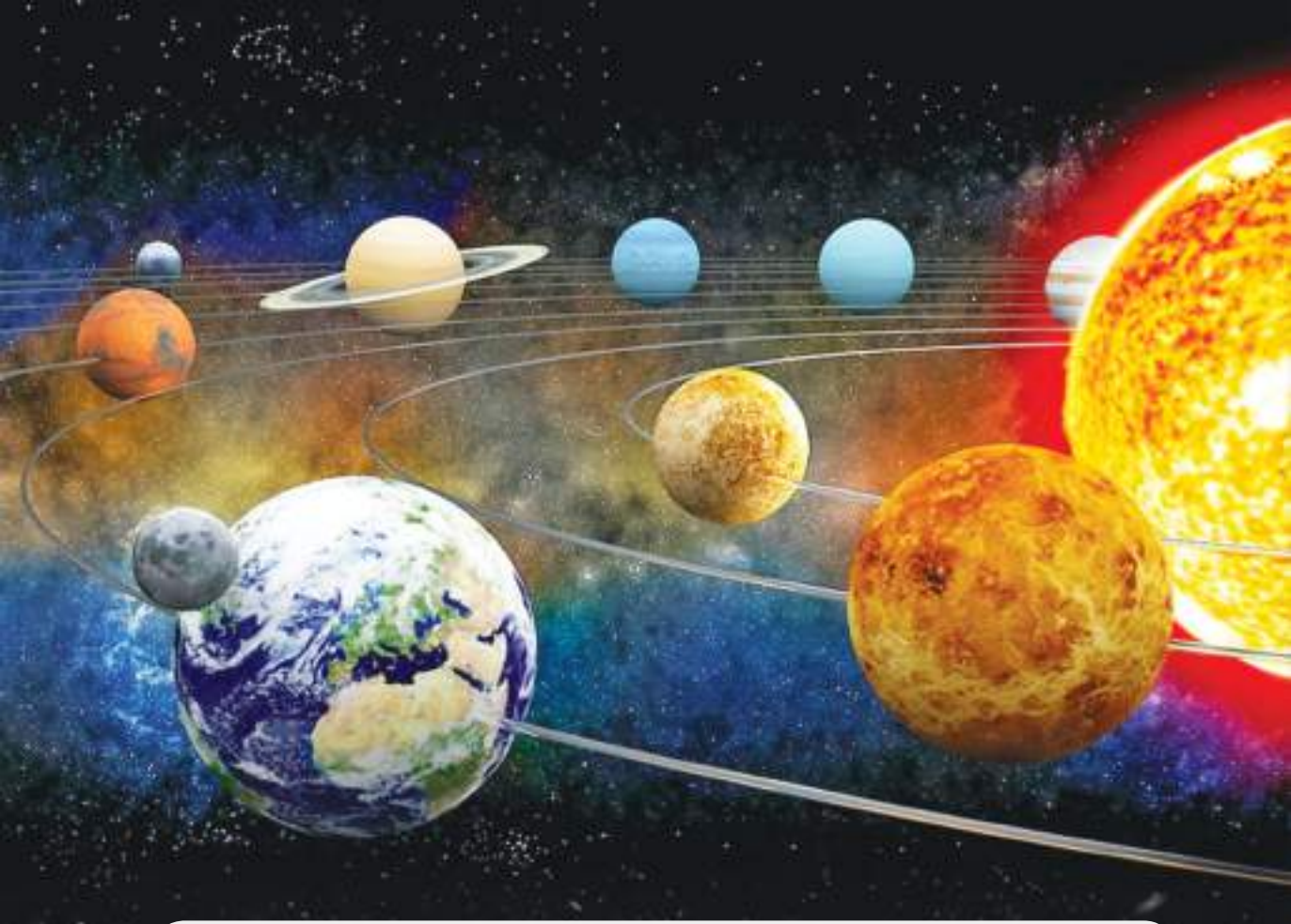

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিজ্ঞান ভাবনা

এস ডি সুব্রত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তাঁর সমস্ত জীবনকর্মই মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য। ছেলেবেলা থেকেই কবি গুরুর বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ছিল। মানবতার সাধক সুন্দরের পূজারি রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বাল্যকাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না'।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশ শতকের শেষ ভাগে এবং বিশ শতকের প্রথমভাগে বেঁচে ছিলেন। উনিশ শতকের প্রথম ভাগেই ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ঘটে যায়। স্টিম ইঞ্জিন ব্যাপকভাবে চালু হলে পৃথিবীর দূরত্ব ঘুচতে শুরু করে ফলে, সভ্যতার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। রবীন্দ্রনাথের জন্মের ঠিক আগেই ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ জীববিদ্যার ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়ে বসে। প্রায় একই সময়ে রসায়নবিদ্যায় নানা আবিষ্কার, বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার, জীবাণুতত্ত্বসহ নানা উদ্ভাবন মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক রূপান্তর

ঘটাতে শুরু করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মের পর শৈশবেই সকল নতুন নতুন উদ্ভাবনের কথা জানতে পারলেন। আমরা অনেকেই জানি যে শিশু রবীন্দ্রনাথ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় মনোযোগী ছাত্র না হয়ে উঠতে পারলেও ঠাকুরবাড়ির পাঠশালায় গৃহশিক্ষকদের রুটিন পাঠের হাত থেকে রেহাই পাননি। গণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যায় পাঠ নিতে হতো ঠাকুরবাড়ির কিশোর বালকদের। আর সাহিত্যে পাঠ নিতে হতো মেঘনাদবধ কাব্য থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে আমাদের জানিয়েছেন যে, কঙ্কাল খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মানব দেহের খুঁটিনাটি শেখাতেন এক পণ্ডিত। আর মানব দেহের বৈজ্ঞানিক পাঠ নিতে মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগে লাশকাটার আদ্যোপান্তও দেখতে যেতে হতো ঠাকুরবাড়ির কিশোর বালকদের। এসব কারণে রবীন্দ্রনাথের কিশোর মন বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠে । কবি আরো বলেছেন- 'সপ্তাহে একদিন রবিবার 'সীতানাথ দত্ত ঘোষ মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন।... যে রবিবার সকালে তিনি না আসিতেন, সে রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।' আরো জানা যায় , পিতার সাথে যখন ডালহৌসি পাহাড়ে বেড়াতে যেতেন সেটা নিছক পাহার দর্শন থাকতো না; পাহাড়ে বেড়ানোর প্রতিটি সন্ধ্যা অবলীলায় জ্যোতির্বিদ্যার প্র্যাক্টিকাল সেশন হয়ে ওঠতো। জ্যোতির্বিদ মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুত্রকে পাহাড়ের চূড়া থেকে সন্ধ্যাবেলায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে নক্ষত্রমণ্ডলীর গ্রহ নক্ষত্রদের চিনিয়ে দিতেন। পিতার কাছ থেকে পাওয়া ধারণা নিয়েই কবিগুরু ১২ বছর বয়সে ১৮৭৩ সালে লিখেছিলেন প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র'। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ঠাকুর বাড়ি থেকে শিশু-কিশোরদের জন্য 'বালক' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। রবীন্দ্রনাথ সে পত্রিকায় পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে শিশু-কিশোর উপযোগী লেখা দেবার জন্য নিয়মিত লেখক হিসেবে মনোনীত হন।

'বালক' পত্রিকায় বালক কবি প্রায় প্রতি সংখ্যায় লিখতেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাধনা' নামে পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ 'সাধনায়' প্রাণিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে বেশ অনেকগুলো লেখা দিয়েছিলেন।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ক এক প্রবন্ধ লিখে বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্রকে চমকে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহবশেই তিনি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের সাহচার্য পেয়েছিলেন। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্রের গবেষণার বিষয় নিয়ে 'বঙ্গদর্শন'-এ রবীন্দ্রনাথ 'জড় কি সজীব?' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যেটি ১৯০১ ছাপা হয়েছিল। সেটি পড়ে আচার্য জগদীশ চন্দ্র



বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিজ্ঞানী আইনস্টাইন- জার্মানি, ১৯৩০

বসু বিস্মিত হয়েছিলেন আর তিনি তার সেই বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে ,'তুমি যদি কবি না হইতে তো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতে।'

রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক হতে চাননি কিন্তু আজীবন বিজ্ঞান চর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছেন মানবকল্যাণের কথা ভেবে। বিজ্ঞানের ক্রম অগ্রগতি তিনি নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতেন। তিনি যখন ১৯২৬ সালে ইউরোপের পথে বেরুলেন, গেলেন জার্মানিতে, গেলেন আইনস্টাইনের সাথে দেখা করতে। আইনস্টাইন তখন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব প্রকাশ করে বিজ্ঞানের জগতে আলোড়ন তুলেছেন। সেখানে আইনস্টাইনের কাছে ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কথা জানতে পারলেন। ফিরে এসে তিনি অনুজ সত্যেন বোসকে খুঁজে বের করলেন এবং তার সাথে বিজ্ঞান চর্চায় যুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ যর্থাথই বুঝেছিলেন অন্ধ বিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা জাগাতে বিজ্ঞান চেতনার বিকল্প নেই। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন সমাজের অধিকাংশ মানুষ বিজ্ঞানবোধের অভাবটি বুঝতে পারেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার গোটা জীবনের বিজ্ঞান ভাবনাকে পরিণত বয়সে এসে গ্রন্থিত করার কথা ভাবেন। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো তিনি ১৯৩৭ এ 'বিশ্বপরিচয়' নামে যে প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশ করেন সেটি মূলত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ।

'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের প্রবন্ধের সূচিটি দেখলেই তা স্পষ্ট হয়। পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক, ভূলোক ইত্যাদি। সহজ বাংলায় বিজ্ঞানের অমন কঠিন বিষয়গুলো পরিচিতি দিয়েছেন 'বিশ্বপরিচয়' নামের গ্রন্থে। এক অসম্ভব বিজ্ঞানভাবনা কবির মনকে প্রভাবিত করেছিল। কুসংস্কার ও জড়তা ত্যাগ করে মানুষের বিজ্ঞানমনস্ক মনোভাবকে এগিয়ে রাখতেন রবি ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মানুষের মাঝে বিজ্ঞানের অভাববোধ না থাকাটাই মানুষকে পেছনে ফেলে রাখে এবং তিনি বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞানের অগ্রগতিই সভ্যতার ভিত্তি মজবুত করতে পারে। ❑

কবি ও প্রাবন্ধিক

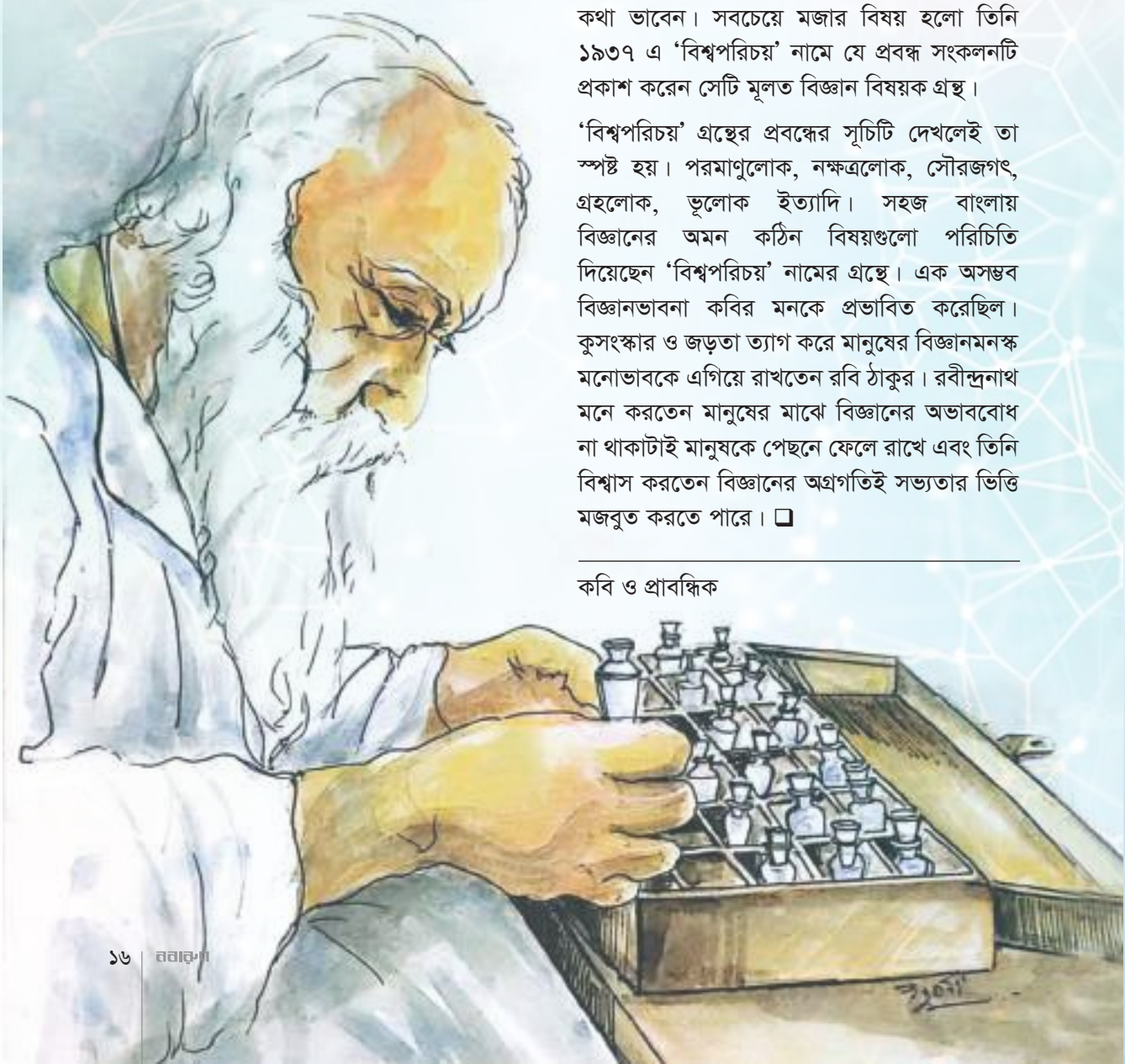



পিকুসাইটিস

নাসরীন মুস্তাফা

তাপুদের পাড়ায় ওকে আগে দেখা গেছে বলে মনে হচ্ছে না। আমি আর তাপু নতুন কাউকে দেখলেই ছুটে যাই। নতুন মানুষ মানে নতুন একটি বই। নতুন মানুষের সাথে মিশে তার সম্বন্ধে যত জানতে থাকি ততই বই পড়ার মতো আনন্দ খুঁজে পাই।

পিকুর সাথে আমাদের আলাপ হয়েছিল প্রথম দিনেই। পিকুর নাম-ধাম সব জেনে ওকে দেখিয়ে দিলাম, রোজ বিকেলে কোথায় খেলি আমরা। ফুটবলে সেন্টার ফরোয়ার্ডিং-এ পিকুর নাকি কোনো জুড়ি নেই। সেই প্রমাণ আমরা সেই দিনই পেয়ে গেলাম।

পিকুর সাথে সত্যিই ভালো কাটছিল সময়টা। ঝামেলা বাঁধল কয়েক মাস পর। এক বুড়ো মতো নারী পিকুকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না! পিকু নাকি তার হারিয়ে যাওয়া ছেলে। পিকুর সত্যিকারের বাবা-মাকে ডেকে আনার পর সব শুনে ওই নারী থামলেন। কিন্তু বিস্ময় ভাবটি যাচ্ছিল না। তার ছেলেটা নাকি একদম পিকুর মতো দেখতে। উনি যখন কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছিলেন, তখন আমরাও না কেঁদে পারলাম না।

পিকুকে নিয়ে এরকম ঝামেলা আজকাল প্রায়ই হচ্ছে। শপিং মলে গেলে কেউ না কেউ এগিয়ে এসে নানান নামে ডাকে পিকুকে, শান্তিবাগ কি মিরপুরের হায়দার সাহেবের কি রোজিনা খালার ছেলে নাকি এই পিকু। পিকু বা ওর বাবা-মা কেউ তাদেরকে চিনতে পারে না। এক ভদ্রলোক তো আল্লাহর কসম কেটে বলেছিলেন, পিকু নাকি নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া হাজিগঞ্জ রেললাইন রোডের হাজি ননী মিয়ার ছোটো ছেলে পল্টু। পিকুর চেহারা হুবহু পল্টুর মতো দেখে ভদ্রলোক প্রায় মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন।

জেএসসি পরীক্ষায় সারা বাংলাদেশের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে যে ছেলেটা, তার ছবি দেখে আমরাও থ' হয়ে গেলাম। এ যে একদম আমাদের পিকু! যদিও পিকু এখনো জেএসসি দেয়নি, আমাদের সাথেই আগামী বছর দেবে। সেদিনের পর থেকে রাস্তায় বেরুলেই ঝামেলা হতো পিকুর। কোনো কোনো মা পিকুকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলতেন, তুমি কী খেয়ে এত ভালো করলে বাবা? তুমি কয় ঘণ্টা পড়ো বাবা? অমুক অঙ্কের ঝামেলা তুমি কী উপায়ে সমাধান করেছ বাবা?

এত এত বাবা শুনতে শুনতে পিকু নাকি আজকাল ওর মায়ের মুখ থেকেও বাবা ডাক শুনতে চায় না। ঘর থেকে বেরুতে চায় না। সারাক্ষণ মেজাজ তিরিক্ষি করে রাখে। ওর সাথে আড্ডা তো দূরের কথা, দেখাই তো হচ্ছে না।

এরকম এক সময়ে আমি আর তাপু দেখলাম, রিকশায় করে পিকু যেন কোথায় যাচ্ছে। 'ও পিকু' বলে ডাকলাম, ছেলেটা বড়ো বড়ো চোখ করে তাকালো আমাদের দিকে, কিন্তু মুখের ভাব দেখে মনে হলো আমাদেরকে মোটেও চিনতে পারছে না। পর মুহূর্তেই দেখি, ফার্মেসিতে ঔষুধ কিনছে পিকু। ওদিকে তাপু দেখালো, রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুচ্ছে পিকু। একই সময়ে দুই দুইটা পিকুকে দেখে আমাদের মুখ একদম হা হয়ে গেল।

পিকুদের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, পিকুর জ্বর এসেছে। আমাদের দেখে মুখটা তেঁতো করে বলল, সর্দিজ্বর ভাল্লাগে না। একটু এদিক-ওদিক হলেই এরকম ঠান্ডা লেগে যায়। ভাল্লাগে না।

আমরা তখনো মুখ হা করে আছি। কোনো কিছু বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। পিকু এইসাঁ বলে জোরে রুমাল উড়িয়ে একখানা হাঁচি দিল, একটু যে সরে বসব, তা-ও পারলাম না। পিকুর শুকনো মুখের স্যরি শুনে ইটস্ ওকে বলতেও ব্যর্থ হলাম।

পিকু শুয়ে শুয়ে রিমোট টিপে টিপে টিভির চ্যানেল পাল্টাচ্ছিল। হঠাৎ এক চ্যানেলে এসে থমকে গেল ও। পেট্রোল বোমা ছুড়তে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে এক কিশোর। সাংবাদিক চোখ পাকিয়ে গলা ফাটিয়ে বলছেন, শিশু-কিশোরদের এরকম জঘন্য কাজে জড়িত করা ঠিক না।

পিকু কাঁদতে কাঁদতে বলল, দেখলি তোরা? ওই বদমাশ ছোড়াটাও যে আমার মতোই দেখতে!

পিকু কেঁদে কেঁদে বলল, ঢাকা শহরে আসাই উচিত হয়নি। এখানে আসার পর থেকেই গাদা গাদা পিকু তৈরি হতে দেখছে। আগে যখন ওরা জাফলং ছিল, তখন তো এরকম ঝামেলা ছিল না।

তাপু বলল, তোরা আগে জাফলং ছিলি? চলে এলি কেন?

আমার শরীরটা ভালো যেত না। প্রায়ই ঠান্ডা-জ্বর হতো, মা আমাকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসতে চাইলেন। বাবা চা-বাগানের চাকরিটা ছেড়ে দিলেন কেবল আমার জন্যই। অথচ বংকল বলেছিল, কোথাও যেতে হবে না। আমার অসুখ সেরে যাবে।

আমরা দু'জনে একসাথে বলি, বংকল!

বদরুল আংকল। সংক্ষেপে বংকল। বিরাট বিজ্ঞানী। আমাকে বড়ো ভালোবাসতেন। চুপি চুপি ওর ল্যাবরেটরিতে চলে যেতাম। বিশাল একটা যন্ত্র- রেডিয়েশন, মানে তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে পরীক্ষা করার যন্ত্র ছিল ওখানে। বংকল আমার শরীরে রেডিয়েশন দিয়েছিল বেশ চড়া মাপে। এতে নাকি আমার ঠান্ডার ভাইরাসটা মরে ভূত হয়ে যাবে।

হয়নি তো!

পিকু আরেকটা হাঁচি দিয়ে বলল, সব ডোজ তো দিতে পারিনি। বংকল কাউকে বলতে মানা করেছিল।



সপ্তাহখানেক পেটে রাখলাম, তারপর কীভাবে কেন যে বলে দিলাম! মা আর বাবা সব জেনে বকা দিলেন বংকলকে। আর একদিনও ওখানে থাকা হয়নি। আর দেখা হয়নি বংকলের সাথে। চলে এলাম ঢাকায়।

তাপু ফিসফিস করে বলে, তোর শরীরে রেডিয়েশন দেওয়ার পর কার কার সাথে দেখা হয়েছিল, মনে আছে? শান্তিবাগ কি মিরপুরের হায়দার সাহেবের কি রোজিনা খালার ছেলে-নারায়ণগঞ্জের হাজি ননী মিয়ার ছেলে পল্টু-

হবে হয়ত। কত মানুষের সাথেই তো দেখা হয়। সব কি মনে থাকে?

পিকুর ক্লান্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে তাপু বলে, তোর মনে থাকে না, তবে তোর ভাইরাসটার মনে থাকে। রেডিয়েশনের ফলে সম্ভবত পিকুর শরীরে থাকা ভাইরাসটি মিউটেশন হয়ে পিকুসাইট হয়ে গেছে। সর্দি-কাশি-হাঁচির মাধ্যমে ওটি ছড়িয়ে পড়ছে। ওর নিজের ডিএনএ মানুষের শরীরে ঢোকাতে গিয়ে পিকুর ডিএনএ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এরপর যার পিকু মার্কা সর্দি-জ্বর হচ্ছে, সে আস্তে করে পাল্টে যাচ্ছে পিকুর আদলে। হয়ে যাচ্ছে পিকু।

আমি এবং তাপু পিকুকে নয়, নিজেদেরকেই দেখতে থাকি। নাকের ভেতরটা সুঁড়সুঁড় করছে। তাপু মহা কষ্টে নাক কুঁচকে রেখেছে, ওর নাকের অবস্থাও সুবিধার নয়, বুঝতে পারছি। দাঁতে দাঁত কামড়ে বসে আছি, হাঁচব না কিছুতেই। কিছুতেই না।

ওদিকে পিকু ভ্যা করে কান্না জুড়ে দিল। হাঁচি ঠেকানোর চেষ্টায় আমরা দু'জন মন দিয়ে পিকুর কান্না শুনতে থাকি। মনোযোগটা অন্য দিকে নিয়ে যদি বাঁচা যায়। ❑

শিশুসাহিত্যিক



ড্যাবলু, ট্যাবলু আর বিজ্ঞানী মামা

খায়রুল বাবুই

'সারাদিন শুধু টিভি, না হয় মোবাইল। টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। কতক্ষণ ধরে ডাকছি।' মা বিরক্ত হয়ে বললেন।

টিভিতে 'টম অ্যান্ড জেরি' কার্টুন চলছে। একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছে আদিয়ান। একটু পর পর হো হো করে হেসে উঠছে। রুমের আরেক পাশে সোফায় কাত হয়ে শুয়ে আছে আবান। দুই হাতে ট্যাব মানে 'ট্যাবলেট পিসি' ধরা। পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে গেম খেলছে। মা যে রুমে এসে কথাগুলো বললেন, সেদিকে দুজনের খেয়ালই নেই যেন।

'কী হলো ড্যাবলু আর ট্যাবলু, কথা কানে যায় না?' মা হালকা ধমকের সুরে বললেন।

টিভি স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে মায়ের দিকে এক পলক তাকালো আদিয়ান মানে ড্যাবলু। কিছু না বলে আবার মনোযোগ দিল টম অ্যান্ড জেরির দুষ্টুমিতে। স্কুলে থাকার সময়টা বাদে বাসায় প্রায় সারাক্ষণই টিভির দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে আদিয়ান। এজন্য মা ওকে ডাকেন 'ড্যাবলু'। আর ট্যাবে সারাক্ষণ গেমিং নিয়ে ব্যস্ত থাকে বলে আবানকে ডাকেন 'ট্যাবলু'।

ড্যাবলু পড়ে ক্লাস টুতে। ট্যাবলু সিক্সে। পড়াশোনায় একদম মন নেই। কিছুতেই ওদেরকে মোবাইল, টিভি বা ট্যাবের আসক্তি থেকে দূরে সরানো যাচ্ছে না।

হঠাৎ 'ইয়েস' বলে চিৎকার করে উঠল আবান মানে ট্যাবলু। অর্থাৎ গেমে জিতেছে। ট্যাবটা সোফায় রেখে সোজা হয়ে বসল সে। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খিদে লেগেছে।'

মা বললেন, ' সেটাই তো বলছি। টেবিলে খাবার দিয়েছি সেই কখন।'

'আচ্ছা মা, আর মাত্র দুই মিনিট। কার্টুনটা শেষ হোক।' ড্যাবলু বলল।

'ঠিক আছে। দুই মিনিট পর দুজনকেই টেবিলে দেখতে চাই। তোদের ছোটো মামা অপেক্ষা করছে।' বলেই মা কীসব বিড়বিড় করতে করতে চলে গেলেন।

টেলিভিশনে কার্টুন দেখা আর ট্যাবে গেম খেলা নিয়ে

এতটাই মগ্ন দুই ভাই, প্রায় চার বছর পর যে ওদের ছোটো মামা বেড়াতে এসেছে তা ভুলেই গেছে। মামার কথা শুনে দ্রুত খাবার টেবিলের দিকে দৌড়ে গেল দুজন। দেখল, মামা সত্যিই অপেক্ষা করছেন ওদের জন্য।

'কী হে, ড্যাব আর ট্যাব, সারাদিন ঘরে বসে থাকলে হবে?' মামা মুচকি হেসে বললেন, 'একটু বাইরের আলো-বাতাসও তো চোখে লাগাতে হবে। শুধু কম্পিউটার আর ট্যাবেই না, মাঠে গিয়েও খেলাধুলা করতে হবে।'

উত্তরে কিছু না বলে মামার পাশের দুই চেয়ারে গিয়ে বসে দুজন। ছোটো মামার নাম মাহফুজ রবিন। লন্ডনে থাকেন। মামা নাকি বিজ্ঞানী। দীর্ঘদিন পর দেশে এসেছেন।

'মামা, তুমি কতদিন থাকবে?' খেতে খেতে ট্যাবলু জানতে চাইল।

'আমি দেশে এসেছি একটা গবেষণার কাজে। দুই মাসের ছুটিতে। কাজ শেষ হলে এর আগেই চলে যাব।'

'আচ্ছা মামা, গবেষণা কী?' ড্যাবলু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো মামার দিকে।

মামা একটু ভেবে বলেন, 'গবেষণা মানে হলো নতুন কোনো বিষয়ে খোঁজখবর করা, বিস্তারিত জানা ও বোঝা।'

ট্যাবলু বলল, 'তুমি কী নিয়ে গবেষণা করছ মামা?'

মামা পানির গ্লাসে চুমুক দেন। তারপর বলেন, 'তোদের মতো যারা সারাক্ষণ মোবাইল বা টিভির স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাদেরকে কীভাবে এসব থেকে দূরে রাখা যায়, আমি গবেষণা করছি তা নিয়ে। বিভিন্ন দেশের শিশুদের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে। তাদের মা-বাবার সঙ্গে কথা বলছি। অনেক পড়াশোনাও করতে হচ্ছে'।

'এখনও পড়াশোনা?' ড্যাবলু অবাক, 'মা বলেছিল, তুমি নাকি স্কুলে থাকতে সারাক্ষণ পড়াশোনা করতে। এখন তো বড়ো হয়ে গেছ। বিজ্ঞানীও হয়েছ। এখনও তোমাকে পড়াশোনা করতে হয়?'

ড্যাবলুর কথা শুনে মা-বাবা শব্দ করে হেসে ওঠেন। মামাও মুচকি হাসেন। শুধু ড্যাবলু-ট্যাবলুকে চিন্তিত দেখা যায়।

'শোন্ ড্যাব আর ট্যাব, পড়াশোনার কোনো শেষ নেই। সারাজীবনই পড়তে হবে, শিখতে হবে, জানতে হবে।'

মামার খাওয়া শেষ হয়। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাবেন, তখনই ট্যাবলু চিন্তিত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'আচ্ছা মামা, বেশিক্ষণ টিভি, মোবাইল বা ট্যাব দেখলে কী কী সমস্যা হয়? আমাদের তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না।'

ট্যাবলুর কথায় মাথা নাড়িয়ে সায় জানায় ড্যাবলু।

মামা ট্যাবলুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'ওহে আমার জুনিয়র বিজ্ঞানীরা, এখন খাওয়া শেষ করে ঘুমাতে যা। আগামীকাল তো স্কুল বন্ধ। সকালে তোদের নিয়ে ঘুরতে বের হব। তখন এ বিষয়ে কথা বলব, ঠিক আছে।'

ড্যাবলু-ট্যাবলু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা।'

ওদের মা-বাবাও নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করেন। দুজনের মুখেই রহস্যময় হাসি।

দুই.

'মামা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?' গাড়ির পেছনের সিটে বসা ড্যাবলু জানতে চায়। তার পাশের সিটে ট্যাবলু বসা।

মামা গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ড্যাবলুর প্রশ্ন শুনে বললেন, 'শহরের বাইরে একটা জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছি। আজ আমরা মোবাইল আর টিভির বাইরে একটা জগৎ দেখব, যা তোরা আগে হয়ত দেখিসনি।' পেছনের দিকে ফিরে বাম হাতটা বাড়ালেন মামা, 'এজন্য আগে ট্যাব আর মোবাইলটা আমাকে দে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মামার আদেশ পালন করতে হলো দুজনকে। কারণ সকালে বাসা থেকে বের হওয়ার সময় বাবা কঠোরভাবে বলে দিয়েছেন, 'রবিন মামা যা যা বলবেন, সব শুনতে হবে।'

গাড়ি ছুটছে। ড্যাবলু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ট্যাবলু বসে আছে মুখ ভার করে। মোবাইলে কার্টুন দেখছিল সে। মাঝপথেই মামাকে মোবাইল দিয়ে দিতে হলো।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর গাড়ি থামল। ঝিমুনি চলে এসেছিল ড্যাবলু ও ট্যাবলুর। চোখ খুলে দেখল, রাস্তার দুই পাশে বিশাল সবুজ গ্রাম। নানারকমের গাছগাছালি। পাখি ডাকার শব্দও শুনতে পেল ওরা।

গাড়ি থেকে নামল সবাই। সামনেই থাকা বড়ো একটা গাছ দেখিয়ে মামা বললেন, 'এটা কী গাছ, চিনিস?'

প্রশ্নটা শুনে হো হো করে হেসে উঠল ট্যাবলু, 'চিনব না কেন? এটা তো আমগাছ। ওই তো, গাছে কাঁচা কাঁচা আম ঝুলছে।'

'বাহ্ ট্যাবলু, ঠিকই বলেছিস।' এরপর ড্যাবলুর দিকে ফিরে মামা বললেন, 'তুই কি গাছের আমগুলো দেখতে পাচ্ছিস?'

ড্যাবলু চোখ ছোটো করে গাছের দিকে তাকালো। বিশাল বড়ো গাছ। তার চোখে ঝাপসা লাগছে। সে চোখ কচলে বলল, 'মামা, আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। সব কেমন যেন ঘোলা লাগছে।'

মামা শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'এর কারণ কী জানিস?'

'আমগুলো অনেক উপরে, তাই দেখতে পাচ্ছি না।' ড্যাবলু বলল।

'নাহ্।' মাথা নাড়িয়ে মামা বলেন, 'কারণ, তুই সারাক্ষণ মোবাইলের ছোটো স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকিস। এতে চোখের পেশিগুলো দুর্বল হয়ে গেছে। বাইরে তাকালে তাই আর ফোকাস করতে পারিস না।'

মামার কথা শুনে ট্যাবলু অবাক, 'সত্যিই মামা?'

'হ্যাঁ।' মামা আমগাছটার দিকে তাকিয়েই বলেন, 'টিভি, মোবাইল বা ট্যাবের স্ক্রিনের দিকে একটানা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখে চাপ পড়ে। চোখ শুকিয়ে যায়, চোখ লালও হয়ে যায়। এভাবে দিনের পর দিন করতে থাকলে দূরের জিনিস ঝাপসা দেখা শুরু হতে পারে। বুঝেছিস?'

মামার কথা শুনে ড্যাবলু- ট্যাবলু একটু ভয়ই পায়। এমন সমস্যার কথা আগে ওরা কখনো শোনেনি।

'ঠিক আছে। চল্, ওদিকটায় যাই।' বলে মামা মূল রাস্তা ছেড়ে সরু একটা রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করেন। ড্যাবলু আর ট্যাবলু মামার দুই পাশে। হাঁটতে হাঁটতে হ্যারি পটারের গল্প বলছিলেন মামা। কিছুদূর হাঁটার পর একটা নদীর ধারে পৌঁছালো ওরা। মামা ট্যাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, হ্যারি পটার গল্পের লেখকের নামটা যেন কী?'

ট্যাবলু মাথা চুলকে বিড়বিড় করে বলল, 'ইয়ে, সরি মামা, ভুলে গেছি।'

মামা হেসে বললেন, 'এটাই তো সমস্যা। আমরা যখন কোনো কাজে মনোযোগ দিই না, তখন স্মৃতিশক্তি কমে যায়। আর তুই যখন একটানা মোবাইল বা টিভি দেখিস, তখন মনোযোগ শুধু ওই স্ক্রিনে আটকে থাকে, ফলে অন্য কোনো কথায় বা কাজে মনোযোগ থাকে না। একটু আগেই আমি বলেছি হ্যারি পটারের লেখকের নাম জে. কে. রাউলিং। কিন্তু তোরা ভুলে গেছিস।'

ট্যাবলু একটু লজ্জা পেল যেন। বিষয়টা বুঝতে পেরে মামা বললেন, 'সমস্যা নেই। আজকের পর থেকে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে। ঠিক আছে?'

ড্যাবলু আর ট্যাবলু হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালো।

ততক্ষণে কড়া রোদ উঠেছে। তবুও নদীপাড়ের শীতল বাতাসে আরাম লাগছে ওদের। ড্যাবলু আর ট্যাবলুর চুল বাতাসে উড়ছে। মামার মাথায় চুল একদমই কম, তাই সেভাবে উড়ছে না।

যেদিকে চোখ যায় সবুজ গাছপালা। ড্যাবলু আর ট্যাবলু প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেয়। নদীতে অনেকগুলো হাঁস সাঁতার কাটছে। গ্রামের ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়ছে নদীতে। সাঁতরাচ্ছে। কী ভীষণ আনন্দ করছে সবাই।

আদিয়ানকে হাতের ইশারায় দৃশ্যটা দেখিয়ে আবান বলল, ' দেখেছিস, ওরা কেমন মজা করছে। আমার খুব ভালো লাগছে।'

'হ্যাঁ ভাইয়া, আমারও।' আদিয়ান বলল।

ইশ্! ওরাও যদি এমনটা করতে পারত। মনে মনে আফসোস করতে লাগল দুই ভাই। মামাকে সেটা বলল না। হাঁটতে হাঁটতে ওরা পৌঁছালো একটা স্কুলের কাছে। স্কুলের সামনে বিশাল মাঠ। কয়েকজন ছেলে ফুটবল খেলছে। মেয়েরাও নানারকম খেলাধুলায় ব্যস্ত।

ড্যাবলু আর ট্যাবলুর দিকে তাকিয়ে মামা বললেন, 'কী হে, তোরাও নামবি নাকি মাঠে? ফুটবল খেলবি?'

একযোগে মাথা নাড়ালো দুজন। কারো দৌড়াতে মন চাইছে না। শরীর কেমন যেন নিস্তেজ লাগছে। এতটুকু পথ হেঁটেই ওরা হাঁপিয়ে উঠেছে।

মামা বললেন, ' তোরা সারাদিন ঘরে বসে বা শুয়ে মোবাইল, ট্যাব আর টিভি দেখিস। তাই শরীরের হাড় ও পেশিগুলো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। সেজন্যই খেলাধুলায় উৎসাহ পাচ্ছিস না।'

মামার মতো একই ধরনের কথা বাবা-মা প্রায় প্রতিদিনই বলেন। কিন্তু ওরা তাতে কান দেয়নি কখনো। আজ দুজনই বুঝতে পারছে, কথাগুলো শোনা উচিত ছিল।

'মামা, দুপুর হয়ে গেছে। বাসায় গিয়ে খেতে হবে।' তাড়া দিল আবান।

'ঠিক আছে, চল।'

তিনজন ফিরতি পথে হাঁটা শুরু করল। আদিয়ানকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। গাড়িতে উঠেই সে বলল, 'মামা, আমরা কি তাহলে আর মোবাইল দেখতে পারব না?'

আবান ঝট করে তাকালো আদিয়ানের দিকে। 'আরে ট্যাবলু, তুই কেঁদে দিচ্ছিস নাকি? মোবাইল দেখতে না পারলে আমরা টিভি দেখব।'

মামা গাড়ি স্টার্ট দিতে গিয়েও থামলেন। হেসে বললেন, 'ড্যাবলু আর ট্যাবলু, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কী বলেছে জানিস?'

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা? সেটা আবার কী?' ট্যাবলু অর্থাৎ আবান অবাক কণ্ঠে বলল। ড্যাবলুও প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মামার দিকে।

ড্রাইভিং সিট থেকে পেছনের দিকে ফিরে মামা বললেন, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সারা বিশ্বে মানুষের নানা ধরনের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কাজ করে। বুঝেছিস?'

ড্যাবলু আর ট্যাবলু ডানে-বামে মাথা নাড়ালো। অর্থাৎ বোঝেনি।

'আচ্ছা, ঠিক আছে।



এত বোঝার দরকার নেই।' মামা বললেন, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্য দিনে এক ঘণ্টার বেশি স্ক্রিন দেখা ঠিক না। আর তোদের মতো একটু বড়ো শিশুদেরও নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট একটা সময় মোবাইল, টিভি বা ট্যাবে সময় কাটাতে বলেছেন তারা।'

আবান ও আদিয়ান এতদিন এসব নিয়ে বাবা-মায়ের বকাই খেয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানী মামার কাছ থেকে ব্যাখ্যা শুনে ভীষণ টেনশনে পড়ে গেল।

'শোন্, মন খারাপ করিস না। এটা হলো অভ্যাসের ব্যাপার। মোবাইল বা টিভি দেখা একেবারে ছেড়ে দিতে হবে না। শুধু সচেতনভাবে ব্যবহার করতে হবে।' মামা ওদের আশ্বস্ত করেন, 'যেমন দিনে এক ঘণ্টা মোবাইল বা ট্যাব দেখতে পারিস, তবে সে সময়ে শিক্ষণীয় কিছু দেখবি। বাকি সময়টা খেলাধুলা করবি, গল্পের বই পড়বি, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করবি। এতে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকবে। ঠিক আছে?'

ড্যাবলু আর ট্যাবলু দুজনই ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে মামার মুখের দিকে। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে তারা সিদ্ধান্ত নেয়, আজ থেকে মা-বাবার কথা মেনে চলবে। কারণ টিভি আর মোবাইল নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকলে নিজেরই ক্ষতি। জেনে, বুঝে কেউ নিজের ক্ষতি করে না, এটা ওরা ভালো করেই জানে।

মামা গাড়ি স্টার্ট দিলেন। খোলা জানালা দিয়ে আসা ঠান্ডা বাতাসে উড়ছে ড্যাবলু আর ট্যাবলুর মাথার চুল। প্রতিদিনই তো স্কুল থেকে বাসায় ফেরে ওরা। কিন্তু আজ বাসায় ফেরাটা অন্যরকম ভালো লাগার। কারণ দুই ভাই মিলে মা-বাবাকে একটি সিদ্ধান্ত জানিয়ে চমকে দিতে যাচ্ছে কিছুক্ষণ পরই। ❑

সাংবাদিক ও শিশুসাহিত্যিক





বিজ্ঞানে অবদান

গোলাম নবী পান্না

বেতারেই কান পেতে গান শুনি বেশ!
সুরে সুরে বয়ে যায় মায়াবী সে রেশ।
উড়ে উড়ে দূরে দূরে আকাশের গায়
উড়োজাহাজটিও নীলে মিলে যায়।

এমন এ দৃশ্যটা দৃষ্টিতে এলে
মনে নানা প্রশ্নটা শুধু যায় খেলে।
সহজে কি সমাধান? তাও যদি চাও,
পেয়ে যাবে ঠিক তবে মাথাটা খাটাও!

বিজ্ঞানে জ্ঞানী যারা তারা ঠিক পারে
তাদের সে সৃষ্টি দেখি বারে বারে।
এমন প্রমাণ যত সৃষ্টির কাজে
বিজ্ঞানী দিয়েছেন বিশ্বের মাঝে।

আমরা তা পেয়ে যাই তাদের সে গুণে
কখনো বা দেখে আর কখনো বা শুনে।
ডিজিটাল যুগে এই মোবাইলটা হাতে
বিজ্ঞানের অবদান প্রমাণটা তাতে।



ড্রোনের ছড়া

ওমর ফারুক নাজমুল

আধুনিক বিজ্ঞানের ড্রোন বিস্ময়
ড্রোন দিয়ে যুদ্ধেও আনে সংশয়।
ড্রোন দিয়ে কৃষিকাজ ড্রোন দিয়ে ছবি
ড্রোন দিয়ে দেখা হয় সবই।

ড্রোন যাবে একদিন মঙ্গল ও চাঁদে
শেষে বুঝি ড্রোনে ড্রোনে ঠোকাঠুকি বাঁধে।
ড্রোন নিয়ে দেশে দেশে মাতামাতি খুব
আগামীতে সাগরেও ড্রোন দেবে ডুব।

হয়ত বা ড্রোনই হবে আকাশ-বাহন
গড়ে দেবে মনে-মনে মেলবন্ধন।
দেশে দেশে ড্রোনপোর্ট হবে একদিন
ড্রোন যাবে ঢাকা থেকে আমেরিকা, চীন।

অভিনব অভিযান

আতিক রহমান

মহাকাশ ডাকে আয়— তার বুক আঙিনায়
এনে দিবে জীবনের মুখরিত তান,
স্বপ্নীল আলো দিবে আছে 'আলোয়ান'।
অভিনব দিয়ে আশা— অপেক্ষমান 'নাসা'

ভাসমান নগরীর দিল সন্ধান!
সে নগরী মহাকাশে দোদুল্যমান।
নীলেরই পরে রাখা বেগুনির রংমাখা
সীমাহীন বিস্মৃত মহাকাশ পাড়ি—

বলো কে কে যেতে চাও পৃথিবীকে ছাড়ি?
'স্পেস সিটি' হবে— শহরের নাম তবে
'লুনার কলোনি' হবে, হবে তার ফাঁড়ি
অপেক্ষমান র'বে— মহাকাশ গাড়ি।

গাড়ি মানে— মহাকাশ যান
মহাকাশে ওড়া এক সেই সাম্পান
রকেটের মতো করে উড়ে যাবে খাড়া
মহাকাশে যাবে আগে পশ্চিমারা।

'স্টার শিপে' চড়ে মহাকাশ যান ভরে
আনন্দ ভ্রমণেতে যাবে বলো কারা?
প্রিয় সোনা, টুকটুকি যাবে নাকি তারা।
মহাকাশে চলবে যে— নৌকোর মতো সেজে

'সোলার সেল' তারই বিজ্ঞানী নাম
সূর্যের আলোতেই চলে অবিরাম।
কে কে যাবে ওঠো আজ, হোক বিধিবাম।
গ্রহান্তরে আহা কত ঘুরলাম।

গল্প

ষড়শৃঙ্গ কোঠা

দীপু মাহমুদ

রুম্পাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ির সবাই অস্থির হয়ে গেছে। রুম্পার বয়স বারো বছর। সে হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। আজ রবিবার ইশকুল বন্ধ। রুম্পার বাড়িতে থাকার কথা। কিন্তু সে বাড়িতে নেই। তাকে বাগানে, মাঠে, বাজারে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এখন বর্ষাকাল। নদীর পানি ফুলে উঠেছে। নদীতে বিশাল বিশাল ঢেউ আর প্রবল স্রোত। হাটবোয়ালিয়া গ্রামের পাশে মাথাভাঙ্গা নদী। বর্ষাকালে নদীর চেহারা হয়ে যায় ভয়ংকর। এলাকার মানুষ বলে নদী প্রতি বছর কোনো একজন মানুষকে টেনে নেয়।

নদীর চেহারা এখন হয়ে গেছে ভয়ংকর। প্রতি বছর কোনো এক হাটের দিনে নদী পার হতে গিয়ে নৌকা ডুবে যায়। নদীর মাঝখানে সেদিন ঘূর্ণিপাক তৈরি হয়। সেই ঘূর্ণিপাকে আটকা পড়ে মানুষ মারা যায়। নদীতে এবার ঘূর্ণিপাক ওঠেনি, নৌকা ডুবে যায়নি। তবু গ্রামের কয়েকশ মানুষ নৌকা নিয়ে নদীতে নেমে পড়েছে রুম্পাকে খুঁজতে।

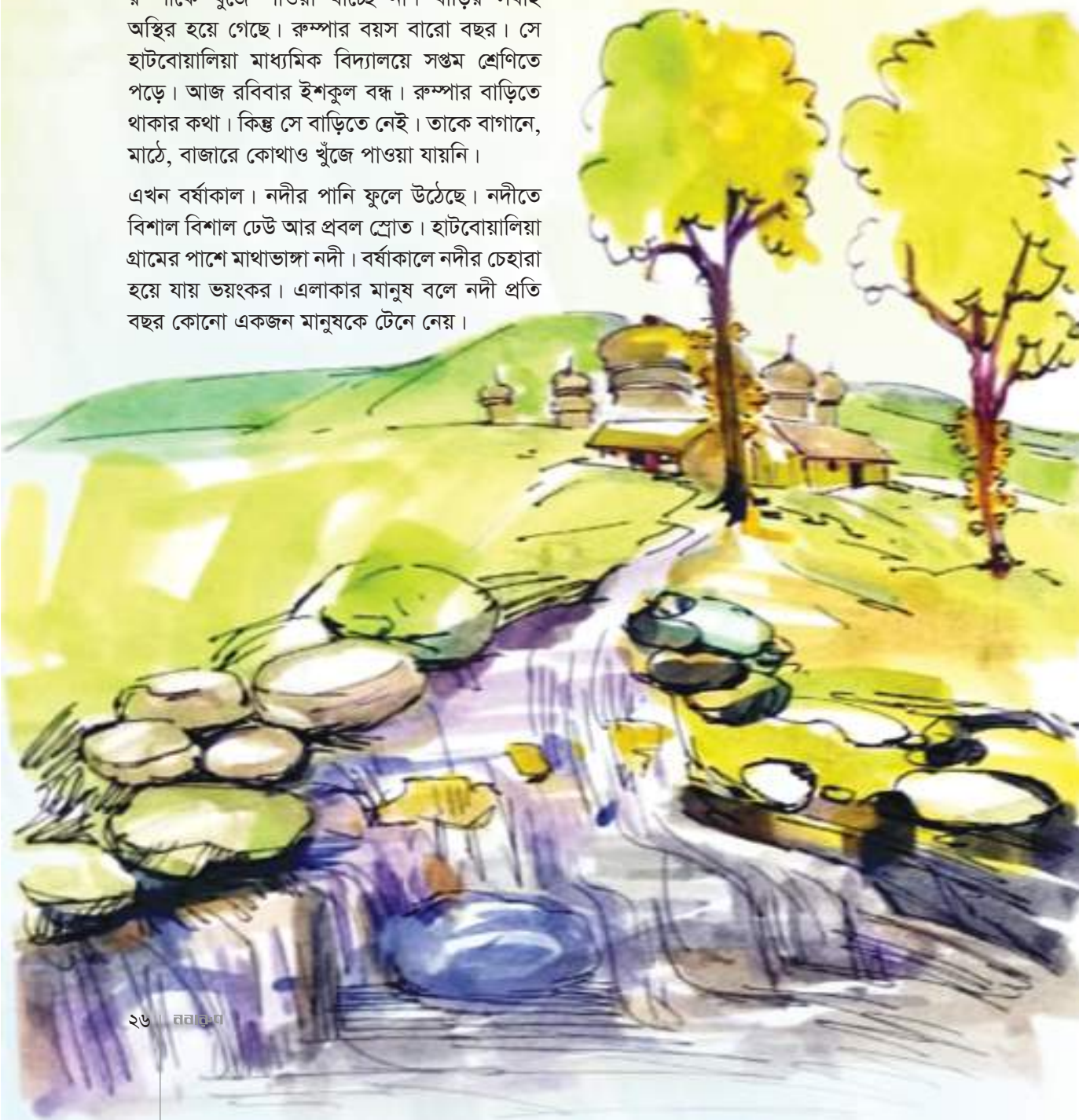

রুম্পা আছে মাটিপালার গহিন জঙ্গলে। মাথাভাঙ্গা নদীর পুবদিকে উঁচু পাড়। এই জায়গার নাম বড়বোয়ালিয়া। মাথাভাঙ্গা নদী এখানে বড়শির মতো বাঁক নিয়েছে। তার উত্তর-দক্ষিণে টিলার মতো উঁচু জায়গা। এলাকার মানুষ বলে মাটিপালা। যেখানে মাটিপালা দিয়ে রাখা হয়েছে। তবে কে কবে কেন মাটিপালা দিয়েছিল সে ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে পারে না।

নজর আলি মাটি ঘষে লাঠিতে ভর দিয়ে বড়বোয়ালিয়া থেকে এসেছিল হাটবোয়ালিয়াতে। তার বয়স কত হয়েছে কেউ সঠিক বলতে পারে না। তিনি নিজে বলেন শোয়াশো বছর। মানে একশত পঁচিশ বছর। মানুষজন বলে আরো বেশি। নজর আলির বয়স দেড়শ বছর হবে! নজর আলি বললেন, ওই জায়গার নাম ছড়শিং কুঠি। অনেক আগে যুদ্ধ হয়েছিল খুব। সেই যুদ্ধের সেনাপতি কুঠি বানিয়েছিল এখানে। তার দলবল নিয়ে থাকত।

গহিন জঙ্গল শেয়ালে ভরে উঠেছে বলে সেখানে কেউ যায় না। নজর আলির ভাষায় ছড়শিং কুঠি এখন শেয়ালের রাজত্ব। কেউ কেউ সেখানে মেছো বাঘও দেখেছে।

রুম্পা বলে, জায়গাটা আমার ভীষণ চেনা। এই জায়গার নাম ছড়শিং কুঠি নয়, ষড়শৃঙ্গ কোঠা, আমি জানি। ছয় শিংওয়ালা বাড়ি। বাড়ির সদর দরজায় বড়ো বড়ো দুটো নাগলিঙ্গম গাছ ছিল।

সেখানে রুম্পাকে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। মাটিপালার একপাশে বৃহৎ এক নাগলিঙ্গম গাছ আছে। সেই গাছ কেউ চিনত না। কালচে সবুজ পাতা। ফুল ধরার পর বেলের মতো গোল গোল ফল হয়। রুম্পা প্রথম বলেছিল এই গাছের নাম নাগলিঙ্গম। হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিএসসি শিক্ষক মোজাম্মেল হক অনেক বইপত্র পড়ে নিশ্চিত করেছিলেন যে, এই গাছের নাম নাগলিঙ্গম। ইংরেজি নাম ক্যাননবল ট্রি। এ গাছের ফল হাতির প্রিয় খাবার। এই ফলকে হাতির জোলাপ বলে।

রুম্পার বড়ো ভাই ভ্রমর অবাক হয়ে বলল, তুই কেমন করে জেনেছিস এই গাছের নাম নাগলিঙ্গম! আগে কোথাও দেখেছিস, বইতে?

রুম্পা বলল, এই গাছ আমি চিনি। একটা নয়, দুটো ছিল। জানো দাদা, আমার মনে হয় আমাদের অনেকগুলো হাতি ছিল। হাতির পেটে ব্যথা হলে এই নাগলিঙ্গম গাছের ফল খেতো। নাগলিঙ্গম গাছের ফল খেলে হাতির পেট ব্যথা ভালো হয়ে যেত।

ভ্রমরের কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে। রুম্পার কথা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। আবার এড়িয়েও যেতে পারছে না। তার বলা কথাগুলো এক সময় ঠিক মিলে যায়।

এর আগে একবার গ্রামে একজন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। পেট ফেঁপে মরে যাওয়ার অবস্থা। অনেক চিকিৎসা করেও অসুখ ভালো করা যাচ্ছিল না। কবিরাজ বললেন, অশোকগাছের সন্ধান পাওয়া গেলে এই অসুখ নিরাময় সম্ভব ছিল।

অশোকগাছ কোথায় আছে সেই খবর কবিরাজের কাছে থাকার কথা। গাছগাছড়া নিয়েই সে থাকে। তার কাছে অশোকগাছের সন্ধান নেই। অশোকগাছের সন্ধান দিয়েছিল রুম্পা। তিন গ্রাম ওপারে এক বাঁশবাগানের ভিতর। বহু বছরের পুরাতন গাছ। কেউ কখনো তার গুরুত্ব দেয়নি। নামও জানতে চায়নি। ঝাড়ের বাঁশ নিয়ে মানুষের আগ্রহ ছিল। তার ভিতরের গাছ নিয়ে নয়।

ভ্রমর বলল, তুই কীভাবে জানিস এখানে অশোকগাছ আছে?

রুম্পা বলল, খুব ছোটোবেলায় এসেছি। বেড়াতে এসেছিলাম। মনে হয় এখানে আমাদের আত্মীয়স্বজন আছে।

ভ্রমর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলল, তুই আমার থেকে নয় বছরের ছোটো। তুই আমার আপন ছোটো বোন। তোর ছোটোবেলায় এখানে বেড়াতে এসেছিলি তা আমি জানব না! এই গ্রামে তো আমাদের কোনো আত্মীয় নেই।

কেউ কেউ বলে রুম্পা জাতিস্মর। পরজন্ম হয়েছে। মাঝেমধ্যে তার আগের জন্মের কথা মনে পড়ে।

মোজাম্মেল হক স্যার বলেন, মানুষ একবারই জন্মায়। মানুষের পূর্বজন্ম, পরজন্ম বলে কিছু নেই।



কতক সাধু নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতা দেখাতে আগের জন্মের এমন সব স্মৃতির কথা বলে বেড়ান। এ অতি সাধারণ প্রচলিত বিশ্বাস ছাড়া কিছু নয়।

ভ্রমর বলল, তবে 'দেজা ভ্যু' বলে তো বিজ্ঞানে কিছু আছে!

মোজাম্মেল হক স্যার বললেন, তা অবশ্য আছে। কখনো কেউ হয়ত এমন কোনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে যার চারপাশের সবকিছু তার অচেনা। হঠাৎ কোনো বাড়ি, মানুষ কিংবা অন্য কিছু দেখে তার মনে হলো, আরে এটা তো চেনা। আগেও দেখেছে। খুব চেনা চেনা লাগছে! অথচ সে আগে কখনো দেখেনি। এরকম কমবেশি আমাদের সকলের হয়। মনোবিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন দেজা ভ্যু। কিন্তু তা তো ক্ষণিকের ঘটনা। খুব অল্প সময়ের জন্য হয়ে থাকে। আবার তখনি সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যায়। রুম্পার ব্যাপার সেরকম নয়। তার যে অনুভূতি তাকে ক্ষণস্থায়ী বলা যাচ্ছে না। খুব অল্প সময়ের জন্য, মানে দেজা ভ্যু-র মতো মাত্র কয়েক সেকেন্ড বা মিনিটের জন্য সেটা ঘটছে না। রুম্পার মনে কিছু ঘটনা স্থায়ী হয়ে আছে।

রুম্পাকে মাটিপালায় খুঁজে পেয়েছে ভ্রমর। কেন জানি তার মনে হয়েছিল রুম্পা সেখানে গেছে। কেন মনে হয়েছিল জানে না। তবে মাটিপালার জঙ্গলে গিয়ে অস্থির হয়ে চারপাশে খুঁজছিল। তার হাতে ছিল বাঁশের লাঠি। যদি শেয়ালে আক্রমণ করে তাহলে এই লাঠি দিয়েই শেয়ালের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। জঙ্গলে সাপ থাকে। এখানে বিষধর সাপ আছে কিনা ভ্রমর জানে না। রুম্পার নাম ধরে জোরে ডাকতে পারছে না। জোরে ডাকলে আশপাশের মানুষ শুনতে পারবে। তারপর যদি সত্যি রুম্পা এখানে থাকে তাহলে মানুষজন বলবে রুম্পাকে ভূতে বা জিনে ধরেছে। তাকে ওঝার কাছে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দেবে। ভূতে গ্রামের মানুষের প্রবল বিশ্বাস।

ভ্রমর এদিক-ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে ডাকতে থাকল, রুম্পা, অ্যাই রুম্পা আছিস। ডাকতে ডাকতে ভ্রমর কখন জঙ্গলের অনেক গভীরে চলে এসেছে বুঝতে পারেনি। বড়ো বড়ো গাছ আর ঝোপজঙ্গলের জন্য এখানে দিনের আলো ভালোভাবে ঢুকতে পারে না। পায়ের নিচে অন্ধকার হয়ে থাকে। গাছের ডাল আর পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে যেটুকু আলো ঢোকে তাতে যতটুকু দেখা যায়। রুম্পাকে দেখা গেছে। সে মাটিতে উবু হয়ে কিছু দেখছে।

কাছে গিয়ে ভ্রমর বলল, অ্যাই রুম্পা, তুই এখানে কেন এসেছিস?

চমকে উঠেছে রুম্পা। এখানে অন্য কেউ আসতে পারে সে ভাবেনি। ভয় কাটিয়ে বলল, দাদা, এই জায়গাটা আমার খুব চেনা। কেন এত চেনা সেটা বুঝতে পারি না। এখানে বাড়ি ছিল। সেই বাড়ির ছয়টা শিং ছিল। তাই এই বাড়ির নাম ছিল ষড়শৃঙ্গ কোঠা। আমার সব মনে আছে দাদা, বিশ্বাস করো।

বিভ্রান্ত হয়ে গেছে ভ্রমর। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। ভ্রমর বলল, এখন বাড়ি চল।

রুম্পা বলল, দেখো দাদা, বাড়ির চারটা শিং খুঁজে পেয়েছি। আর দুটো কোথায় গেল!

থমকে গেছে ভ্রমর। মাটিপালা নিয়ে অনেক গল্প আছে। গ্রামের লোকজন কেউ কেউ বলে, চারগম্বুজ মসজিদ ছিল এখানে। জিনের বানানো মসজিদ। এক রাতে বানিয়েছিল এক হাজার জিন। সেই মসজিদে নামাজ পড়তে ঢুকেছিল মানুষ। মানুষ আর জিনে তখন কথা কাটাকাটি হয়। জিনের বানানো মসজিদ জিন মাটি চাপা দিয়ে দিয়েছে। মাটির ওপর কেবল ভেসে আছে মসজিদের চারটা গম্বুজ।

রুম্পা বলল, দাদা চারটা নয়, গম্বুজ হলে এখানে ছয়টা হবে। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে।

ভ্রমর বলল, জায়গাটা খারাপ। বাড়ি যাবি চল। সবাই তোকে খুঁজছে। নদীতে জাল ফেলা হয়েছে। তোকে খুঁজে না পেয়ে গ্রামের মানুষ সবাই অস্থির হয়ে গেছে।

রুম্পা কাতর গলায় বলল, বাড়ির আর দুটো শিং খুঁজে দাও, দাদা। আমি বলে দিচ্ছি বাড়ির আর দুটো শিং কোথায় ছিল।

ভ্রমর বলল, শোন রুম্পা, এটা কোনো বাড়ি ছিল না। এটা নীলকর সাহেবদের কুঠি ছিল। ছড়শিং কুঠি। এরকম কুঠি আশপাশে আরো আছে। চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর ভরা নীলকর সাহেবদের বানানো নীলকুঠি।

রুম্পা বলল, দাদা, এটা নীলকুঠি নয়। এখানে অনেক হাতি ছিল। সদর দরজায় দুটো নাগলিঙ্গম গাছ ছিল। হাতি অসুস্থ হলে সেই নাগলিঙ্গম গাছের বেলের মতো ফল খেতো। তুমি কেন বুঝতে পারছ না!

অসহায় গলায় ভ্রমর বলল, নিমাই চাচা তো বলেছেন এখানে নীলকুঠি ছিল। সেই কুঠিতে নীলচাষিদের ধরে এনে খুব অত্যাচার করা হতো। এক সময় নীলচাষিদের অভিশাপে সেই কুঠি মাটির নিচে দেবে যায়।

রুম্পা স্থির গলায় বলল, তুমি অভিশাপে বিশ্বাস করো দাদা! প্রতি বছর নদীতে মানুষ মারা যায় সেটা কার অভিশাপে? নাকি নৌকায় মানুষ বেশি হয়ে যায়, নদীর পানির ঘূর্ণিপাকে পড়ে নৌকা তলিয়ে গেলে তাতে মানুষ মারা যায়!

ভ্রমর তার এই বোনকে ভীষণ ভালোবাসে। খানিক অস্বাভাবিকতা রুম্পার ভেতর আছে। কখনো কিছু ঘটনা ঘটার আগে বলে দেয়। বারবার বলে এই

মাটিপালা তার অতি চেনা। তবে কীভাবে সম্ভব তা ধারণা করতে পারে না।

রুম্পা বাড়ির আরো দুটো শিং খুঁজে পেয়েছে। বাড়ির আরো দুটো শিং তাকে খুঁজে দিয়েছে ভ্রমর। সে রুম্পাকে বলেছিল, তুই আজ যা চাইছিস আমি তাই করব। তোর সব কথা শুনব। তবে তুই আর কোনোদিন এই মাটিপালায় আসবি না।

রুম্পা রাজি হয়েছে। সে বলল, দাদা, এখানে বাড়ির সদর দরজা। এই পাশে নাগলিঙ্গম গাছ। ওখানে বাড়ির একটা শিং। আর ওই ওখানে আরেকটা। চারটা গম্বুজ আগে থেকে ছিল। রুম্পা যেগুলোকে বাড়ির শিং বলছে। দুই ভাইবোন মিলে আরো দুটো গম্বুজ মানে রুম্পার ভাষায় শিং খুঁজে পেয়েছে। লতাপাতা আর মাটিতে ঢেকে আছে, তবু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সেখানে গম্বুজমতো ছিল। ওপরের ইট ভেঙে ছোটো হয়ে গেছে।

রুম্পাকে নিয়ে আসা হয়েছে কুষ্টিয়ায়। ডাক্তার রুকাইয়া মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। বয়স সত্তর বছর পেরিয়ে গেছে। চশমার ওপাশে ঝকঝকে দুই চোখ ভরা বুদ্ধি আর স্নেহ। তিনি রুম্পাকে দেখবেন। মোজাম্মেল হক স্যারের একজন ছাত্র এই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মোজাম্মেল হক স্যারকে ভ্রমর অনুরোধ জানিয়েছিল রুম্পাকে একজন ভালো মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দেখানোর ব্যবস্থা করার জন্য।

ডাক্তার রুকাইয়ার পাশে অসম্ভব সুন্দর দেখতে একজন তরুণ বসে আছে। ডাক্তার রুকাইয়া তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ওর নাম অরিন্দম। ইংল্যান্ডে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্ট। তোমাদের ওদিকেই বাড়ি, আলমডাঙ্গার ওসমানপুরে। ছুটিতে বাড়ি এসেছে। আমার ছেলের বন্ধু। তোমাদের কথা যা শুনেছি তাতে তার সামনে বলতে পারো, অসুবিধা নেই। প্রয়োজন হলে পরে আলাদাভাবে সিটিং দেব।

রুম্পা তার কথা বলল। ডাক্তার রুকাইয়া বললেন, এ ধরনের ঘটনাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় জেনেটিক মেমোরি। পূর্বপুরুষের স্মৃতি ডিএনএ বা অন্য কোনোভাবে পরের জেনারেশনে চলে আসে। বহু বছর প্রজন্ম থেকে বেশ কয়েক প্রজন্ম পরে কারও ভেতরে তা দেখা দিতে পারে। তখন একজন মানুষ কখনো কোনো জায়গা কিংবা কোনো পরিস্থিতি বা বিপদের মুখোমুখি না হয়েও সেখানে গিয়ে তার কাছে চেনা লাগতে পারে। বা আগের পরিচিত অনুভূতি পেতে পারে।

ডাক্তারের পাশে বসে থাকা অরিন্দম ঘটনা শুনে বেশ কৌতূহল বোধ করছে মনে হলো। সে আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল, তোমাদের বাড়ি কোথায় বললে?

ভ্রমর বলল, আলমডাঙ্গায়, হাটবোয়ালিয়া।

ডাক্তার রুকাইয়া বললেন, এটা হচ্ছে এপিজেনেটিক্স। এটা ব্রেইনের নিউরনে এমনভাবে প্রভাব ফেলে যে নির্দিষ্ট পরিবেশ, গন্ধ, আলো কিংবা শব্দ কারও কাছে অচেনা হয়েও পরিচিত মনে হয়।

অরিন্দম বলল, মাটিপালা বলে যেখানকার কথা বলা হচ্ছে সেটা নিয়ে রিসার্চের আগেই মানুষজন জায়গাটা নষ্ট করে ফেলল। প্রায় ছয়শ বছর আগে ১৫৭৭ সালে মুঘলদের সাথে বাংলার কররানি রাজবংশের যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে মুঘলদের জয় হয়। বাংলার সেনাপতি উসমান খান তখন বড়বোয়ালিয়ার এই মাটিপালা নামের পরিচিত জায়গায় তার বিশ্রাম নিবাস আর প্রতিরক্ষা দূর্গ গড়ে তুলেছিলেন। তখন সেখানে নদী ছিল না। নদী হয়েছে আরো অনেক পরে। সেখানে ছিল গভীর জঙ্গল। সেই দূর্গের ওপরে ছিল শিংয়ের মতো বাঁকানো ছয়টা গম্বুজ। ইতিহাসে এর নাম পাওয়া যায়, ষড়শৃঙ্গ কোঠা। মানে ছয় শিংয়ের অট্টালিকা।

রুম্পার হাত ধরে ভ্রমর বলল, বুঝতে পারছিস? আমাদের আদি বাড়ি হচ্ছে সেই ষড়শৃঙ্গ কোঠা। আমার মনে নেই। তোর মনে আছে।

ভ্রমরের দিকে তাকিয়ে রুম্পা হাসল। হাসলে রুম্পাকে এত সুন্দর দেখায় ভ্রমর আগে খেয়াল করেনি। আজ দেখল। রুম্পাকে ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে। রুম্পা হাসছে। ❑

কথাসাহিত্যিক



রাতুলের বিজ্ঞান ঘর

আজহার মাহমুদ

রাতুল পঞ্চম শ্রেণির একজন ছাত্র। তার ভেতর প্রচণ্ড কৌতূহল। পাখা ঘুরে বাতাস দেয় কেন? আবার বরফ পানির ওপর ভাসে, কিন্তু পাথর ডুবে যায়, এটাই বা কেন? এই রকম হাজারটা প্রশ্ন ঘুরপাক খায় তার ছোট্ট মাথার ভেতর।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে সে দাদুকে খুঁজতে থাকে। রাতুলের দাদুকে সবাই মাস্টার সাহেব বলে ডাকেন। কারণ তার দাদু একসময় স্কুলশিক্ষক ছিলেন।

রাতুলের দাদু বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে পত্রিকা পড়ছেন। এমন সময় রাতুল এক দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করল, দাদু বরফ তো শক্ত, আবার পাথরও শক্ত। তাহলে পাথর কেন ডুবে যায় আর বরফ ভেসে থাকে?

দাদু হেসে বললেন, ওহ, আজ তাহলে আমার বিজ্ঞানের ক্লাস!

রাতুলও চেয়ার টেনে বসে বলল, হ্যাঁ দাদু, শুরু করুন। আজ আমি এই রহস্য জানতে চাই।

দাদু ঘর থেকে একটা স্বচ্ছ কাচের গ্লাস আনলেন। তাতে অর্ধেক পানি ঢাললেন। তারপর ফ্রিজ থেকে একটা বরফের টুকরো এনে ফেলে দিলেন গ্লাসে। বরফটা টুপ করে পড়ে গিয়েও একেবারে ভেসে থাকল পানির ওপর।

দাদু বললেন, দেখলি? বরফটা ডুবল না।

হুম, কিন্তু কেন?

কারণ, বরফের ভেতরে ফাঁকা জায়গা থাকে, বাতাস থাকে। বরফ আসলে পানির চেয়ে হালকা হয়ে যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে 'ঘনত্ব'। বরফের ঘনত্ব পানির চেয়ে কম, তাই বরফ ভেসে থাকে।

রাতুল ভ্রু কুঁচকে বলল, ঘনত্ব মানে আবার কী?

দাদু বললেন, এই গ্লাসে যদি আমরা কিছু পাথরের টুকরো দেই, দেখবি সেটা সঙ্গে সঙ্গেই ডুবে যাবে। কারণ, পাথরের ঘনত্ব পানির চেয়ে অনেক বেশি। এর মানে হলো, পাথর একসাথে অনেক কণায় তৈরি, মাঝখানে ফাঁকা জায়গা নেই। বরফের মতো হালকা না।

রাতুল ভাবল, তাহলে বিজ্ঞান মানে হচ্ছে জিনিসপত্রের ভেতরের খবর জানা।

তখন দাদু হঠাৎ গ্লাসের পানি থেকে বরফটা তুলে নিয়ে মুখে দিলেন। তুইও খা, বরফ খেতে ভালো লাগে না?

রাতুল বরফ মুখে নিয়ে বলল, এটা তো অনেক ঠান্ডা! দাঁতে লাগছে!

দাদু বললেন, এই ঠান্ডাটাও একটা বিজ্ঞান। ঠান্ডা বস্তু আমাদের শরীরের তাপ শুষে নেয়। তাই ঠান্ডা কিছু ধরলে আমরা কাঁপতে থাকি।

রাতুল এবার উঠে গিয়ে ঘরের ফ্যান চালাল। ফ্যান ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে সে দাদুর দিকে ফিরে বলল, এবার তুমি বলো, ফ্যান ঘুরলে কেন ঠান্ডা লাগে?

দাদু চোখে চশমা তুলে তাকিয়ে বললেন, ভালো প্রশ্ন। ফ্যান ঘুরে বাতাস ছড়িয়ে দেয়। বাতাস তোমার শরীর থেকে ঘাম শুকিয়ে দেয়। ঘাম শুকাতে গিয়ে শরীর থেকে তাপ হারায়। তাই ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে। এই ঘটনাকে বলে 'বাষ্পীকরণে শীতলতা'।

রাতুল এক লাফে দাঁড়িয়ে বলল, দাদু, দারুণ! আজকে তো আমি অনেক কিছু শিখে ফেললাম।

তারপর সে চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, তুমি বলো তো, আমি কি বড়ো হয়ে বিজ্ঞানী হতে পারি?

দাদু মাথায় হাত রেখে বললেন, তুই এখনই বিজ্ঞানী। কারণ, তুই প্রশ্ন করিস। তোর মধ্যে জানার ইচ্ছে আছে। এটাই একজন বিজ্ঞানীর প্রথম গুণ।

রাতুল দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, তাহলে চলো দাদু, আমাদের বিজ্ঞান ঘর বানাই।

দাদু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বিজ্ঞান ঘর? সেটা আবার কী?

রাতুল বলল, আমার ঘরটাই হবে বিজ্ঞান ঘর। যেখানে থাকবে বোতল, রং, পানি, আয়না, বাতাস, ঘড়ি, বরফ, পাথর আর থাকবে তুমি। তুমি হবে আমার প্রধান সহকারী।

রাতুলের দাদু হেসে গড়াগড়ি খাওয়ার অবস্থা। দূর থেকে দাদা-নাতির এমন খোশগল্প দেখে রাতুলের মা-বাবাও হাসছে।

সেই দিন থেকেই রাতুলের ঘরে তৈরি হয় একটা ছোট্ট বিজ্ঞান জগৎ। রাতুল সেখানে পানি দিয়ে ঘূর্ণি তৈরি করে, আয়নায় আলো ফেলে সাত রঙের রংধনু বানায়, আবার কৌতূহলী হয়ে ভাবে বাতাসে কাগজ কেন উড়ে যায়।

রাতুলের কাছে বিজ্ঞান আর কোনো কঠিন বিষয় নয়। সেটা এখন এক মজার খেলা। আর তার প্রতিটি খেলাই শুরু হয় একটা ছোট্ট 'কেন' দিয়ে। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক, চট্টগ্রাম সময় পত্রিকা



হুইসপার্স ইন দ্য রেইন

জুয়েল আশরাফ

শহরের নাম আলোরপাড়া। সবসময় মেঘলা, সবসময় কেমন যেন কুয়াশার ঢেউ। আর বর্ষায়? পুরো শহর এক বিশাল বালতির নিচে পড়ে আছে যেন। ধারাসার পানি, কাচে কাচে শব্দ, আর ছাতার নিচে সেকি দৌড়!

এই শহরেই থাকে তিন বন্ধু। তামিম- সবচেয়ে গম্ভীর গোয়েন্দা, কিন্তু ভয় পেলে চুপ হয়ে যায়। রাহিন- যার কাছে প্রত্যেকটা কেস মানে একটা সিনেমা। আর জুনায়েদ অর্থাৎ জুনু, যার হাসি আর খাওয়া দুটোই নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

ওরা নিজেদের বলে, রেইন-স্কোয়াড। বৃষ্টির মধ্যে গাঁটছড়া বাঁধা একটা গোয়েন্দা টিম!

ঘটনাটা শুরু হয় আলোরপাড়া গার্ডেন সোসাইটির এগারো নম্বর রোডে। একটা পুরনো তিনতলা বাড়ি। নাম- নীলাকাশ ভিলা। বাড়ির মালিক মঈন কাকা, একলা থাকেন। আর অভিযোগ? বৃষ্টির রাতে, বাড়ির পেছন থেকে ফিসফিস আওয়াজ আসে... যেন কেউ বলছে, চুপ 'দেখো না কেউ শুনছে কিনা।'

মঈন কাকা ভয়ে রাতে ঘুমাতে পারেন না। ছোটো ভাইকে ফোন দিয়ে বলেছিলেন, হয় ভূত, না হয় বড়োসড়ো ডাকাতের প্ল্যান।

সেই থেকেই রেইন-স্কোয়াড অ্যাকশন মুডে।

তিন বন্ধু বর্ষার ভিজে রাস্তা পেরিয়ে নীলাকাশ ভিলায় যায়। সাথে একটাই সাদা ছাতা, ফ্ল্যাশলাইট আর জুনুর বিস্কুটের বাক্স। তারা বাড়ির পেছনের দিকে যায়। চারদিকে ঝোপঝাড়, পুরনো নারকেল গাছ আর কাঁচা রাস্তায় কাদামাখা পায়ের ছাপ।

রাত আটটা। চারদিক নিঃশব্দ।

তামিম বলে, শোনো... আবার সেই ফিসফিস শব্দ... শুনতে পাচ্ছ?

জুনু হেসে বলে, না, আমি শুধু পেটের গুড়গুড় শুনছি। বিস্কুট দাও।

ঠিক তখনই ফিসফাস!

চুপ... সে আসছে... শব্দ করো না...

তিনজন ঝুপ করে মাটিতে বসে পড়ে।

তারা দেখে, একটা ছায়া চলছে। পেছনে টর্চ নেই, আলো নেই, কিন্তু সে কথা বলছে একা একা!

রাহিন বলে, এইটা কি প্যারানরমাল?

পরদিন বিকেলে তামিম প্ল্যান করে, আজ তারা ছদ্মবেশে যাবে। তিনজন মালি সেজে ঢোকে ভিলার পেছনের বাগানে। জুনুর হাতে কাঁচি আর গালভরা বিস্কুট।

একঘণ্টা পর বৃষ্টি নামে। আবার আসে সেই শব্দ-

চুপ... সে শুনছে...

তারা দেখতে পায়, সেই ছায়া এবার কথা বলছে কাঁধে থাকা এক যন্ত্রের সাথে। জুনু এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে, ধরছি ভূতকে!

আর সামনে পড়ে যায় একজন মানুষ, হাতে একটা ছোটো ওয়াকিটকি! তামিম হাঁ করে থাকে, এটা তো কেয়ারটেকার শামসু ভাই!

শামসু ভাই মাটিতে বসে হাসেন, আরে না না... ভূতের কিছু না ভাইজান! আমি নিরাপত্তা কোম্পানির লোক ডেকে ওয়াকিটকি প্র্যাকটিস করছিলাম। বৃষ্টির শব্দে ঠিকমতো কথা শোনা যায় না, তাই ফিসফিস করে কানে কানে বলছিলাম...

তিন বন্ধু মাথা চুলকে চুপ।

রাহিন বলে, তাহলে পুরো শহর যে ভূত ভূত করেছিল, সেটা সব তোমার ওয়াকিটকির প্রস্তুতি?

শামসু ভাই কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন, অফিসে চাকরি চলে যাইতেছিল ভাইজান!

রেইন-স্কোয়াড পুরো কেস ফাঁস করে। মঈন কাকা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। শহরের মানুষদের মাঝে হাসির রোল পড়ে যায়।

ওরে বাবা, ভূত না হয়ে যদি আরো তিনটা ওয়াকিটকি আসত, তো শহরই খালি হয়ে যেত!

তিন বন্ধু রাস্তার ধারে বসে চা খাচ্ছে।

জুনু বলে, আমি ভাবছিলাম সেই ছায়া আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে!

তামিম বলে, ভয় পাইছিলি?

জুনু চুপ করে, তারপর বলে, আসলে ভয় পাইনি... তবে বিস্কুট পড়ে গেলে খারাপ লাগত!

তিনজন হেসে ফেলে। বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার আলোয়, তাদের ছায়াগুলো লম্বা হয়ে পড়ে থাকে। আর কোথাও একটা ফিসফাস নয় বরং হাসির প্রতিধ্বনি ভাসে- Whispers in the rain, কিন্তু এবার শুধু মজার!

দুই

আলোরপাড়া শহরে বর্ষা মানে কেবল পানি নয়। এটা একটা 'মৌসুমি বিভ্রান্তির উৎসব'। বৃষ্টির সঙ্গে

যেন শহরের সব আজব কাণ্ড মাথা তুলে দাঁড়ায়।

এই তো সেদিন, রেইন-স্কোয়াড ঠিক করেছে তারা এবার বিশ্রাম নেবে। তিনজন মিলে মঈন কাকার বারান্দায় বসে মুড়ি, আচার আর লেবু-চা খাচ্ছিল।

হঠাৎ করে একটা সাদা পায়রা এসে জুনুর মাথায় বসে। রাহিন হাসতে হাসতে বলে, ভাইরে, মাথার চুলকে বাসা ভেবেছে মনে হয়।

কিন্তু পায়রাটা হঠাৎ জুনুর কানের কাছে এসে কাকুর কাকুর করে একরকম শব্দ করে।

তামিম সিরিয়াস গলায় বলে, এইটা নরমাল পায়রা না।

পায়রাটা আবার উড়ে গিয়ে দেয়ালে বসে।

এবার তামিম ফিসফিস করে বলে, এই পায়রার পায়ে একটা কাগজ বাঁধা।

তিনজন ঝাঁপিয়ে পায়রাটাকে ধরার চেষ্টা করে। পায়রাটাও বুঝি এদের ফিল্মি গোয়েন্দা দল ভাবছে, একটা চক্কর মেরে ছাদে উঠে যায় তিনতলার ছাদে।

রাহিন হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, ছাদে ওঠার সিঁড়ি লকড!

তামিম পকেট থেকে কাঁটাতারের কাটা চাবির রিং বের করে। জুনু চোখ কুঁচকে বলে, তুই কবে থেকে চোর হলি রে ভাই?

তামিম গম্ভীর ভঙ্গিতে বলে, আমরা যখন গোয়েন্দা হয়েছি তখন থেকেই।

তিনজন চুপচাপ সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ওঠে। পায়রাটা এবার অদ্ভুত আচরণ করে। এক ঝাঁক পায়রার সঙ্গে ওড়ে... কিন্তু সেই কাগজটা পড়ে যায়।

তারা কাগজটা তুলে দেখে। পুরনো টাইপ করা কাগজ, একটায় লেখা- ধ্বংস শুরু হবে আলোরপাড়া সরকারি লাইব্রেরি থেকে।

তামিম বলে, এটা কি বোমার হুমকি?

জুনু বলে, না, এটা লাইব্রেরিতে বৃষ্টির পানি ঢুকে বই ধ্বংসের কথা হতেও পারে।

পরদিন সকালবেলা তারা তিনজন বৃষ্টি মাথায় নিয়ে লাইব্রেরির দিকে ছুটে। লাইব্রেরির লম্বা চাচা, মালেক ভাই তাদের দেখে চশমা খুলে চেঁচান, এই যে! স্কুল কামাই দিয়ে আবার গুপ্তচরী?

তারা কিছু না বলে ভেতরে ঢুকে। তামিম পেছনের বারান্দা পরীক্ষা করে। মাটি ভেজা, আর ছাদ থেকে একটা কাঠের মই নামানো।

রাহিন বলে, এই লাইব্রেরিতে কে পায়রার মাধ্যমে হুমকি পাঠাবে? আর পি. কে. কে?

জুনু একটা পুরনো বই উলটে পাতা দেখতে থাকে। হঠাৎ বলে, এই দেখো! বইয়ের ভেতরে লেখা- 'Pigeon King strikes again'!

রেইন-স্কোয়াড জানে, শহরে কিছুদিন ধরে গুজব চলছে এক 'পিজন কিং' -কে নিয়ে, যে শহরের পুরনো দালানগুলোতে পায়রার মাধ্যমে খবর পাঠায়, গোপন বার্তা চালায়।

কেউ বলেছে সে গুপ্তচর, কেউ বলেছে সে এক পাগল বিজ্ঞানী। কেউ বলে, সে আসলে আলোরপাড়ার পুরাতন স্কুলের ফিজিক্স স্যার, যিনি পাখিদের সঙ্গে কথা বলতে শিখেছেন!

তামিম আর জুনু ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেয়। তারা সেই পুরনো স্কুলে যায়। ভাঙাচোরা একটা ক্লাসরুমের দরজায় তালা, আর ছাদে বসে পায়রার ঝাঁক।

তামিম দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে একজন লম্বা, টাক মাথার লোক পায়রাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, আজ রাতেই প্ল্যান শুরু হবে। ভিজে কাঠগোলাপ গাছের নিচে সব হবে। কেউ যেন না জানে!

রাত দশটা। বৃষ্টি পড়ছে টুপটাপ। তিনজন বন্ধু কাঠগোলাপ গাছের কাছে লুকিয়ে। তারা দেখে, সেই টাকমাথা লোক। তাদের সন্দেহ পিজন কিং। হাতে এক বাক্স নিয়ে আসছে। তিনি সেই বাক্সটা খুলে গাছের নিচে রেখে দেন আর বলেন, ভোরে এসে নিয়ে যাবো। কেউ যেন ভুলেও না খোলে!

তিনি চলে যান।

তিন বন্ধু একে অপরকে দেখে। জুনু গলা নামিয়ে বলে, বাক্স খুলব?

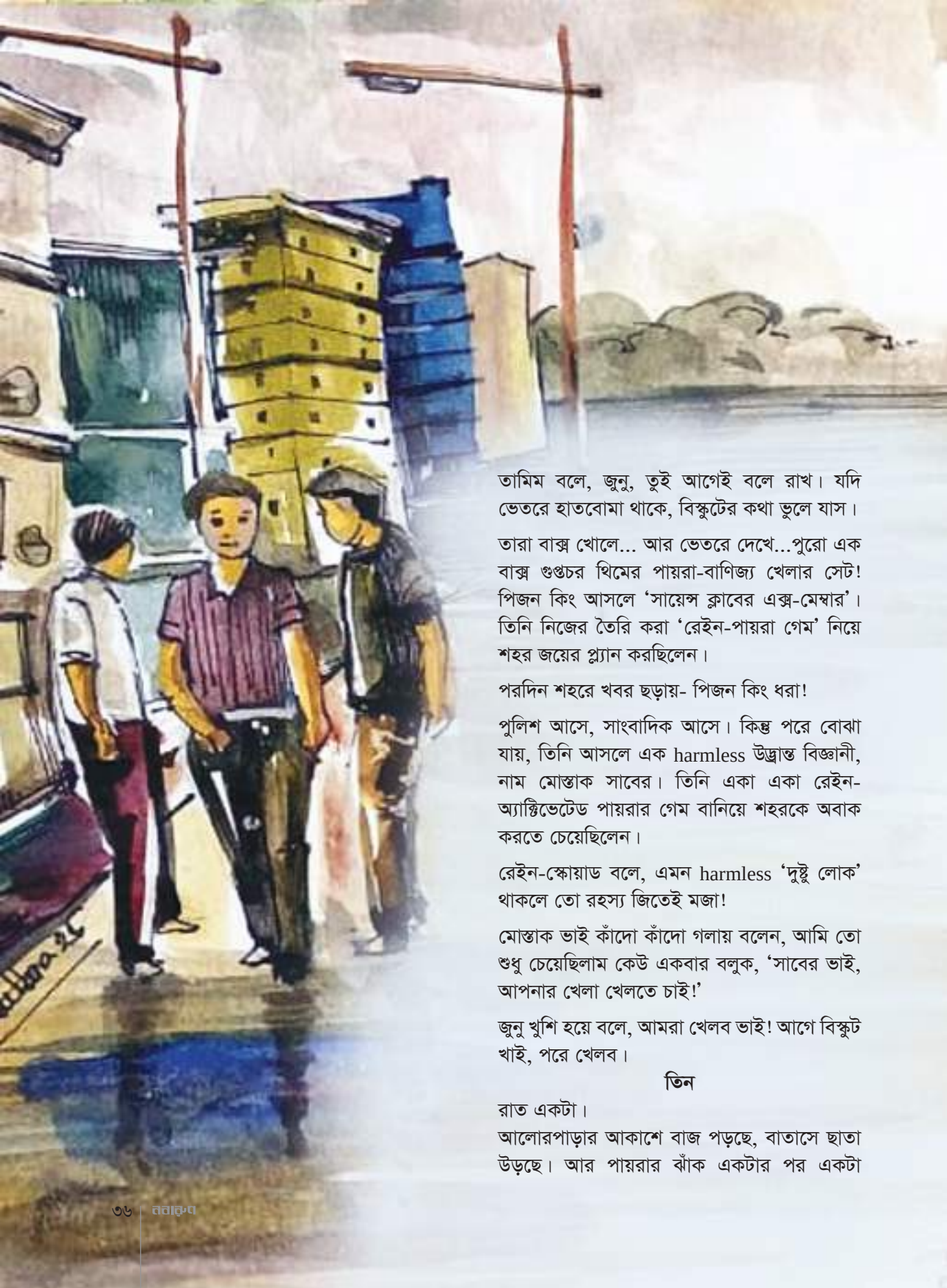

তামিম বলে, জুনু, তুই আগেই বলে রাখ। যদি ভেতরে হাতবোমা থাকে, বিস্কুটের কথা ভুলে যাস।

তারা বাক্স খোলে... আর ভেতরে দেখে...পুরো এক বাক্স গুপ্তচর থিমের পায়রা-বাণিজ্য খেলার সেট! পিজন কিং আসলে 'সায়েন্স ক্লাবের এক্স-মেম্বার'। তিনি নিজের তৈরি করা 'রেইন-পায়রা গেম' নিয়ে শহর জয়ের প্ল্যান করছিলেন।

পরদিন শহরে খবর ছড়ায়- পিজন কিং ধরা!

পুলিশ আসে, সাংবাদিক আসে। কিন্তু পরে বোঝা যায়, তিনি আসলে এক harmless উদ্ভ্রান্ত বিজ্ঞানী, নাম মোস্তাক সাবের। তিনি একা একা রেইন-অ্যাক্টিভেটেড পায়রার গেম বানিয়ে শহরকে অবাক করতে চেয়েছিলেন।

রেইন-স্কোয়াড বলে, এমন harmless 'দুষ্টু লোক' থাকলে তো রহস্য জিতেই মজা!

মোস্তাক ভাই কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন, আমি তো শুধু চেয়েছিলাম কেউ একবার বলুক, 'সাবের ভাই, আপনার খেলা খেলতে চাই!'

জুনু খুশি হয়ে বলে, আমরা খেলব ভাই! আগে বিস্কুট খাই, পরে খেলব।

তিন

রাত একটা।

আলোরপাড়ার আকাশে বাজ পড়ছে, বাতাসে ছাতা উড়ছে। আর পায়রার ঝাঁক একটার পর একটা

উড়ছে ছাদের মাথা ঘেঁষে। তিন গোয়েন্দা তামিম, রাহিন, জুনু ছাদে আটকা। পেছনে মোস্তাক সাবের, বিজ্ঞান-ঘর, সামনে সিঁড়ি। তাও লকড। আর নিচে পুলিশ। কারণ কেউ একটা গুজব ছড়িয়েছে ওরা তিনজন 'ছাতা চোরের চক্রের সদস্য'।

রাহিন গলা খাটো করে ফিসফিসিয়ে বলে তামিম, আমরা পিজন কিং ধরি, কিন্তু এখন আমরাই 'ক্রিমিনাল কিং'!

জুনু বলে, আমি তো শুধু বিস্কুট খাইতে আইছিলাম!

তামিম বলে, আমাদের পালাতে হবে। রেইন-স্কোয়াডের শেষ যদি ছাদেই হয়, তাহলে ছাদটা যেন মিউজিয়ামে রাখা হয়।

রাহিন হঠাৎ পেছনের এক কাঠের বাক্সে হাত দেয়। তাতে লেখা- Emergency Escape Glider - রেইন ভার্সন ০.১।

তিনজন কিছু না বুঝে গ্লাইডার খুলে দেখে, সেটি আসলে তিনটা পলিথিন, ছাতা আর ডাক্তারের স্ট্রেচার দিয়ে বানানো একটা ভেল্কি।

তামিম বলে, মোস্তাক সাবেরের সবকিছুই অদ্ভুত। কিন্তু চল, চেষ্টা করি।

তিনজন একে একে ছাতা-ভেল্কিতে চড়ে লাফ দেয়। ঝড়ো হাওয়ায় তারা কেউ বাড়ির চিমনির পাশ দিয়ে, কেউ কাঁঠাল গাছের উপর দিয়ে, কেউ বা একদম নিচে একটা লন্ড্রি লাইনের কাপড়ে গিয়ে আটকে পড়ে।

নিচে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ ভাইয়েরা প্রথমে ভয় পায়। তারপর দেখে তিন ভিজে কিশোর, একজনের হাতে ধরা পায়রা। আর একজন চিৎকার করছে, আমার বিস্কুট ভিজে গেছে!

ওসি সাহেব মেয়াদোত্তীর্ণ ছাতা মাথায় হাঁপিয়ে এসে বলেন, এরা তো... এই তিনজনই পিজন কিং ধরা গোয়েন্দা!

পিজন কিং ওরফে মোস্তাক সাবেরকে নিয়ে আসা হয়। তিনি একটা মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি চাইছিলাম একটা গেম বানাতে। যেটা বর্ষায় খেলা যাবে, পায়রা থাকবে, ছাতা থাকবে, কিন্তু কেউ ভিজবে না। কিন্তু আমি ভুলে গেয়েছিলাম এই দেশে সবচেয়ে সাহসী হলো শিশুরা। ওই তিনজন কিশোরই বুঝতে পেরেছে গেম তখনই জমে, যখন খেলোয়াড় হয় বুদ্ধিমান।

একজন সাংবাদিক বলে, তাহলে আপনার প্ল্যানটা ব্যর্থ?

মোস্তাক সাবের চোখ মিটমিট করে বলেন, না রে ভাই। ওরা আমার গেম খেলেছে। শেষ পর্যন্ত জিতেছেও। ব্যর্থতা কই?

সন্ধ্যায় পুরো আলোরপাড়া শহর দাঁড়িয়ে হাততালি দেয়। তামিম, রাহিন, জুনু তাদের তিনজনকে একসঙ্গে মঞ্চে ডেকে এনে ওসি সাহেব বলেন, আজ থেকে তোমরা আলোরপাড়ার 'বর্ষা ডিফেন্স ফোর্স'। যার ছাতা নেই, তারা তোমাদের ছায়ায় দাঁড়াবে!

তিনজন একসঙ্গে বলে, আমরা রেইন-স্কোয়াড, আর আমরা সবসময় বৃষ্টির ভেতরে হাঁটতে জানি। ভয় পাই না!

মোস্তাক সাবের হেসে বলেন, তবে একটু-আধটু ভিজে যাও ছেলেরা। এইটাই তো বর্ষার মজা।

রাত নামে। তিন বন্ধু বসে বারান্দায়। ছাতা পাশে রাখা, গায়ে কাঁথা, হাতে মুড়ি ভাজি।

রাহিন চুপি চুপি বলে, তামিম, আমরা আবার কোনো রহস্যে জড়াবো না তো?

তামিম বলে, ছাতা নামালেই বৃষ্টি নামে। রেইন-স্কোয়াড ছাতা তুললেই রহস্য নামে।

জুনু বলে, আর বিস্কুট যদি থাকে, তাহলে আমি আছি।

তিনজন হেসে ওঠে।

আকাশে আবার বাজ পড়ে। দূরে কে যেন ফিসফিস করে বলে, The rain never whispers to those who don't listen. ❑

শিশুসাহিত্যিক

গল্প



রোবো-সিংহ আর শিশুর দল

বিচিত্র কুমার

সবুজপুর এক ছোট্ট গ্রাম। চারপাশে ধানক্ষেত, নারকেল গাছ আর ঝিঁঝি পোকার ডাক। এই গ্রামে থাকে পাঁচজন দস্যি ও কৌতূহলী শিশু- তিতলি, মুনিয়া, বুবু, রনি আর ফুয়াদ। তারা নিজেদের একটি নাম দিয়েছে- 'দুঃসাহসী পাঁচ'। বন্ধুদের মধ্যে অদ্ভুত সব কল্পনা ও খেলা লেগেই থাকে। গ্রামের পাশের ঝোপঝাড়, পুরনো লাইব্রেরি, কিংবা ফাঁকা মাঠ- সবই তাদের অ্যাডভেঞ্চারের জায়গা।



একদিন বিকেলে, যখন সূর্য টিলার পেছনে লুকোচ্ছে, তখন তারা গিয়েছিল গ্রামের উত্তর পাশে এক ঝোপঝাড় ভরা জায়গায়। সেখানে তারা শুনতে পায় একটা অদ্ভুত শব্দ- ঘড় ঘড় ঘড়... যেন মাটির নিচে কোনো যন্ত্র চালু হচ্ছে। প্রথমে ভয় পেলেও কৌতূহল তাদের সাহসী করে তোলে। তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পায় ঝোপের মাঝখানটা কাঁপছে, মাটি ফেটে উঠছে, আর তার ভিতর থেকে উঠে আসছে একটা বিশাল ধাতব সিংহ!

সে সিংহ ছিল রোবট— চোখ দুটো লাল আলোয় জ্বলজ্বল করছে, শরীর জুড়ে তারকাঁটা তার, চাকা আর ধাতব পাত। তারা দাঁড়িয়ে যায় থতোমতো হয়ে। হঠাৎ রোবো-সিংহের মুখ থেকে একটা যান্ত্রিক কণ্ঠে কথা ভেসে আসে— 'বিপদ... সহায়তা প্রয়োজন...'

তিতলি ভয় পেয়ে পেছনে সরে গেলেও মুনিয়া সাহস করে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কে? তোমার কী হয়েছে?' তখন রোবো-সিংহ তার বুকে থাকা এক প্রোজেক্টর চালু করে। সেখানে ভেসে ওঠে এক ভবিষ্যতের পৃথিবী— রোবট আর মানুষ একসাথে বসবাস করছে, কিন্তু এক দুষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টর ক্রক্স তার তৈরি যন্ত্রের মাধ্যমে সব রোবটকে দাসে পরিণত করছে।

রোবো-সিংহ জানায়, সে এসেছে ৩০৪৫ সাল থেকে। সে ছিল রোবট সেনাদের নেতা, কিন্তু ডক্টর ক্রক্স তার স্মৃতি চিপ নষ্ট করে দিয়ে তাকে সময় মেশিনে পাঠিয়ে দিয়েছে অতীতে, এই গ্রামে। এখন তার সময়যন্ত্র বিকল, স্মৃতি অসম্পূর্ণ- তাই তার দরকার সহায়তা। সে শিশুর দলকে জানায়, ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে বাঁচাতে তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

পাঁচজন শিশু সিদ্ধান্ত নেয় তারা সাহায্য করবে। তারা রোবো-সিংহকে গোপনে নিয়ে যায় পুরনো লাইব্রেরির নিচে, যেখানে তারা একটি গোপন ঘর তৈরি করে। তিতলি ও বুবু মিলে বিজ্ঞানের বই ঘেঁটে সময় ট্রান্সফার থিওরি বোঝে, ফুয়াদ আর রনি যন্ত্রাংশ ঠিক করতে থাকে, আর মুনিয়া খাবার ও পানির ব্যবস্থা করে। কয়েকদিন চেষ্টার পর তারা জানতে পারে, রোবো-সিংহের সময়যন্ত্র ঠিক করতে দরকার একটি শক্তিশালী ব্যাটারি, যা পাওয়া যেতে পারে পুরনো রেল ইয়ার্ডে।

রাতে তারা চুপিচুপি রেল ইয়ার্ডে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে কিছু পুরনো রোবট নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। রোবো-সিংহ জানায়, এরা ডক্টর ক্রক্সের 'স্লিপিং গার্ড'- তাদের জাগানো যাবে না। তারা সাবধানে

ব্যাটারি তুলে আনলেও হঠাৎ বুবুর হাত থেকে পড়ে যায় একটি টর্চ। শব্দ হতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে সব রোবট! রোবো-সিংহ সবাইকে নিজের পিঠে তুলে নিয়ে দৌড় দেয়, আর বহু কষ্টে সবাই প্রাণ নিয়ে ফেরে গ্রামে।

পরদিন সকালের আলোয় তারা রোবো-সিংহের সময়যন্ত্রে ব্যাটারি সংযোগ দেয়। এক যান্ত্রিক আলোর ঝলকে সময়ের দরজা খুলে যায়। রোবো-সিংহ বলে, 'এবার চলো, ডক্টর ক্রক্সকে থামাতে হবে।' শিশুরা বলে, 'তোমার সঙ্গে আমরাও যাব।' ভবিষ্যতের সেই শহর ছিল ধ্বংসস্তূপ, যন্ত্রে মোড়া এক ধূসর দুনিয়া। তারা পৌঁছে ডক্টর ক্রক্সের টাওয়ারে। সেই টাওয়ারের ভিতর আধা-মানব আধা-রোবট এক ভয়ংকর চরিত্র বসে আছে- তার হাতে এক শক্তিশালী রিমোট, যার সাহায্যে সে রোবটদের নিয়ন্ত্রণ করে। শিশুরা চুপিচুপি টাওয়ারে ঢুকে পড়ে। রনি ও বুবু মিলে রিমোটের তার কেটে দেয়। তিতলি আর ফুয়াদ ডিভাইসে ভাইরাস প্রবেশ করায়।

রোবো-সিংহ প্রবল গর্জনে ডক্টর ক্রক্সকে চ্যালেঞ্জ করে। শুরু হয় ভয়ানক যুদ্ধ। ডক্টর ক্রক্স লেজারগানে আক্রমণ করে, কিন্তু রোবো-সিংহ বাঁচিয়ে নেয় শিশুদের। শিশুর দল একসঙ্গে চিৎকার করে- 'ভয়কে ভয় করি না!' আর সেই সাহসের শক্তিতে রোবো-সিংহ শেষ আঘাত করে ডক্টর ক্রক্সকে। তার যন্ত্র ভেঙে পড়ে, আর সব রোবট মুক্ত হয়ে যায়।

পৃথিবী ফিরে পায় শান্তি। রোবো-সিংহ বলে, 'তোমরা আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। আজ তোমাদের কারণেই ভবিষ্যৎ রক্ষা পেল।' শিশুরা আবার সময়ের দরজা দিয়ে ফিরে আসে সবুজপুরে।

তারা জানে, ভবিষ্যতের লড়াই হয়ত শেষ হয়েছে, কিন্তু পৃথিবী বিপদে পড়লে আবার ফিরবে রোবো-সিংহ। কারণ সত্যিকারের বন্ধুত্ব আর সাহসের শক্তি সব সময়ই একটানা বয়ে চলে- সময়কে অতিক্রম করে। ❑

গল্পকার





মহাশূন্যের আহ্বান ভয়েজার ১

শাহিনুর রহমান রিয়াদ

নভেম্বর ২০২৬ সালে মানব ইতিহাসে লেখা হতে যাচ্ছে এক অনন্য অধ্যায়। সেদিন, প্রথমবারের মতো কোনো মানব-নির্মিত বস্তু পৌঁছাবে এক আলোক-দিবস দূরত্বে। আলোক-দিবস একদিনে আলো যতদূর যেতে পারে, সেই দূরত্ব; সংখ্যায় প্রায় ২৫.৯৭ বিলিয়ন কিলোমিটার। এটি লাইট বছর নয় বরং একদিনের আলোর অতিক্রান্ত পথের কথা।

এই অসাধ্য সাধনের নায়ক হলো ভয়েজার ১। সেই নিঃশব্দ দূত, যে ১৯৭৭ সালের এক সকালে মহাকাশের গভীর অজানায় যাত্রা শুরু করেছিল। নিরব দৃষ্টিতে প্ল্যানেট পর্যবেক্ষণ করে, রেডিয়েশনের গতি মাপে, চুম্বকীয় ক্ষেত্রের ছোঁয়া গোণে এবং কণার প্রতিটি আন্দোলন নির্ণয় করে, ভয়েজার ১ এখনো আমাদের দূর মহাকাশের অনবদ্য যাত্রী। শুরুতে এর লক্ষ্য ছিল বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের রহস্যময় জগৎ। কিন্তু মানুষের কল্পনার সীমা যেখানে শেষ, ভয়েজার সেখান থেকে আরো এগিয়ে গেছে। পেরিয়ে গেছে গ্রহরাজির সীমানা, ছাড়িয়ে গেছে সূর্যের অদৃশ্য প্রাচীর হেলিওস্ফিয়ার এবং এখন ঘুরছে ইন্টারস্টেলার স্পেসে তারার মধ্যবর্তী নীরব শূন্যতায়।

আজ এই ক্ষুদ্র দূত পৃথিবী থেকে প্রায় ২৪.৯ বিলিয়ন কি.মি. দূরে। তার ক্ষীণ সংকেত ভেসে আসে আমাদের নীল গ্রহে, যা পৌঁছাতে সময় লাগে প্রায় ২৩ ঘণ্টা ৫ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড। ভয়েজার ছুটছে অবিরাম, প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৬১,১৯৫ কি.মি. বেগে।

কোনো তাড়াহুড়ো নেই তার; সে জানে সৌরজগতের প্রান্ত, সেই রহস্যময় ওর্ট ক্লাউড, এখনো হাজার বছরের পথ বাকি। কিন্তু সে থামে না, ক্লান্ত হয় না। তাকে চালিত করছে ক্ষয়িষ্ণু শক্তি- রেডিও আইসোটোপ থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটর (RTG)। এখানে প্লুটোনিয়াম– ২৩৮ এর তেজস্ক্রিয় ক্ষয় থেকে উষ্ণতা আসে, যা বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়। বছরের পর বছর শক্তি কমছে, প্রজ্বলিত আলো ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, ২০৩০ সালের আগেই ভয়েজার ১-এর প্রাথমিক যন্ত্রপাতি নিস্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে থাকা গোল্ডেন রেকর্ড পৃথিবীর সংস্কৃতি, ভাষা, সংগীতের বার্তা- কোটি কোটি বছর মহাশূন্যে ভেসে বেড়াবে। ভয়েজার ১, এই ক্ষুদ্র দূত, মানুষের সাহস, কৌতূহল এবং সীমাহীন স্বপ্নের এক জ্যান্ত প্রতীক হয়ে থাকবে। ❑

সূত্র: NASA, IFL Science

কবি ও বিজ্ঞান লেখক

প্রযুক্তির পদচিহ্ন

মো. মারুফ বিল্লাহ

প্রযুক্তি আজ সাথে থাকে সারাক্ষণ
প্রযুক্তির ছোঁয়ায় মানুষ এখন ভুলো মন
ক্যামেরায় ধরে মুহূর্তের স্মৃতি
ইন্টারনেটে খুলে যায় জ্ঞানের স্থিতি।

ড্রোন উড়ে ছবি তোলে আকাশে
জিপিএস ঘুরে বেড়ায় বাতাসে
সোলার প্যানেল ধরে সূর্যের আলো
সূর্য থেকে শক্তি নিয়ে করে মানুষের ভালো।

ইন্টারনেটে বাড়ে শিশুদের জ্ঞান
মানবজীবনে আশীর্বাদ বিজ্ঞান
সীমাহীন এই বিজ্ঞানের উপহার
মানুষের জীবন হচ্ছে সহজ বার বার।

প্রকৃতি আর বিজ্ঞান

মো. আফজাল হোসেন

প্রকৃতি নিয়ে বিজ্ঞান কথা বলে
কেন বৃষ্টি নামে, কেন নদী দোলে।
কেন ফুল ফোটে সকালবেলায়
কেন সূর্য ওঠে উজ্জ্বল আলোয়।

পাহাড় কেমন করে জন্ম নেয়
মেঘ কেমন করে ভেসে বেড়ায়।
ঝড়-তুফান কীভাবে আসে
সব রহস্য লুকায় প্রকৃতির পাশে।

বিজ্ঞান এনে দেয় জ্ঞানের আলো
শিশুর মন হয় রঙিন ও ভালো।
বিজ্ঞান থাকে আনন্দ খেলায়
মানুষ ও প্রকৃতি গাথা এক সুতায়।



ভবিষ্যতের বিজ্ঞান

মাহবুবুর রহমান

আগামী দিনের পৃথিবী হবে
বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় নতুন রূপে
জ্বালানির প্রয়োজন কমবে ধীরে ধীরে
রোবট করবে কঠিন কাজ ঘরে ঘরে।

চিকিৎসায় আসবে নতুন দিগন্ত
মহাকাশ ভ্রমণ হবে নিয়মিত
ফসল হবে আরও সুরক্ষিত
মানুষ থাকবে ক্ষুধামুক্ত।

শিক্ষা হবে প্রযুক্তিতে ভরা
শিশুরা শিখবে সহজে পড়া
বিজ্ঞান দেবে জীবনে স্মার্ট নীতি
বাড়বে আমাদের কাজের গতি।

বিজ্ঞানের আলো

মো. রুবায়েত আলম

বিজ্ঞানের আলো জ্বলে চারদিকে
অন্ধকার রাতে পথ দেখায় নীড়ে
সূর্যের রশ্মি ধরা পড়ে কাচে
রংধনু সাজে রঙিন এক নাচে।

বিজ্ঞান শেখায় ভাবতে নতুন
বিজ্ঞানীরা খোঁজে উত্তর প্রতি ক্ষণ
শিশুরা জানতে চায় কেমন করে সব হয়
বিজ্ঞানের কাছে থেকে শেখা বড়ো আনন্দময়।

দ্বাদশ শ্রেণি, নটরডেম কলেজ, ঢাকা



বৃষ্টি তবে বৃষ্টি নয়...

শাকিব হুসাইন

বিষ্টি এল কাশ বনে
জাগল সাড়া ঘাস বনে,
বকের সারি কোথা রে
লুকিয়ে গেল বাঁশ বনে।...

বৃষ্টি এলেই ছড়াটা গুনগুন করে আবৃত্তি করে কেউবা খোলা মাঠে, কেউ বারান্দায় বসে বসে। আর তোমরা যারা শহরে থাকো, তোমরা কম কিসে শুনি! তোমরাও তো বেলকনিতে গিয়ে বৃষ্টির ফোঁটা ছুঁতে ছুঁতে ফররুখ আহমদের এই মিষ্টি ছড়াটা আবৃত্তি করো।

বৃষ্টি আমাদের জন্য প্রকৃতির আশীর্বাদ। প্রখর রোদের তাপে যখন মাটি, খালবিল ফেটে চৌচির হয়, তখন বৃষ্টি আমাদের জন্য স্রষ্টার এক অপরূপ আশীর্বাদ হয়ে ধরণির বুকে ঝপঝপ করে নামতে থাকে।

আমরা তো খুবই বৃষ্টি উপভোগ করি। কিন্তু গাছপালা, নদীনালা, নদী-সাগরের নিচে যে প্রাণীগুলো থাকে, ওরা আবার এক ধরনের বৃষ্টি হলে ভীষণ ভয় পায়। ওদের মধ্যে আর সেই আনন্দটা থাকে না।

জানো তো, সেই বৃষ্টিটা হলো এসিড বৃষ্টি। যা আমাদের মানবজাতির বিভিন্ন কার্যকলাপের ফসল। ওদের বিপদের জন্য আমরাই দায়ী।

শোনো তাহলে এসিড বৃষ্টির গল্পটা...

এসিড বৃষ্টি এমন এক ধরনের বৃষ্টিপাত যেখানে উচ্চ মাত্রার নাইট্রিক এসিড ও সালফিউরিক এসিড থাকে। এগুলো আমাদের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি প্রকৃতির জন্যও ভীষণ ক্ষতিকর। এসিড বৃষ্টি কিন্তু তুষার, কুয়াশা আবার ক্ষুদ্র শুষ্ক পদার্থের মতো হতে পারে। যার pH এর মাত্রা দাঁড়ায় ৫.৬-এ। সাধারণ এসিড বৃষ্টির তুলনায় অনেক। এসিড বৃষ্টি প্রথম উদ্ভাবন করেন ১৮৫২ সালে স্কটিশ রসায়নবিদ রবার্ট অ্যাঙ্গাস স্মিথ।

এবার শোনো এসিড বৃষ্টি কেন হয়? মন দিয়ে শোনো কেমন...

সাধারণত কিছু পচনশীল গাছপালা, অগ্নুৎপাতের ফলে কিছু রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয় যা এসিড বৃষ্টির ছোট্ট কারণ, তবে এসিড বৃষ্টির প্রধান কারণ মানুষের নানাবিধ কার্যক্রমের ফসল।

এসিড বৃষ্টির সবচেয়ে বড়ো উৎস– বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা পোড়ানো, কলকারখানার বিষাক্ত কালো ধোঁয়া ও অটোমোবাইল।

জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে আমাদের বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইড নির্গত হয়। এই বায়ুদূষণকারী পদার্থগুলো পানি, অক্সিজেন ও অন্যান্য পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড সৃষ্টি করে। বাতাস এই অ্যাসিডিক যৌগগুলোকে বায়ুমণ্ডলের শত শত মাইল জুড়ে ছড়িয়ে দিতে পারে। যখন এসিড বৃষ্টি পৃথিবীতে নেমে আসে, তখন প্রবাহিত জলের মধ্য দিয়ে পৃষ্ঠজুড়ে প্রবাহিত হয়। আর মাটির নিচে নেমে যায়।

প্রশ্ন আছে, এসিড বৃষ্টির প্রভাবে কী কী হতে পারে? আচ্ছা বাবা বলছি, শোনো...

এসিড বৃষ্টির প্রভাবে বিশেষ করে হ্রদ, ঝরনা, জলাভূমি এবং অন্যান্য জলজ পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এসিড বৃষ্টি পানিকে আরো বেশি অ্যাসিডিক করে তোলে। এর ফলে মাটি থেকে বেশি পরিমাণ অ্যালুমিনিয়াম শোষণ হয়, যা হ্রদ ও ঝরনায় প্রবাহিত হয়। এই সংমিশ্রণ ভূপৃষ্ঠের জলকে জলজ প্রাণীদের জন্য বিষাক্ত করে তোলে।

এসিড বৃষ্টি ও কুয়াশা বনেরও ভীষণ ক্ষতি করে, বিশেষ করে উচ্চতর পাহাড়ি বনাঞ্চলের। এসিডের শুষ্ক জমা মাটি থেকে ক্যালসিয়ামের মতো পুষ্টিকর উপাদান কেড়ে নিয়ে অ্যালুমিনিয়াম নির্গত করে, যা গাছপালার জল শোষণ করতে ভীষণ কষ্ট হয়ে পড়ে।

আমাদের জন্যও এসিড বৃষ্টি ভীষণ খারাপ। এসিড বৃষ্টির ফলে আমাদের চোখ জ্বালানির সৃষ্টি হয়। আর সাথে সাথে হাঁপানির আবির্ভাব লক্ষ করা যায়।

এবার তোমাদের মনে আরো প্রশ্নের ধাক্কা দিচ্ছে বুঝি? ভাবছ এর সমাধান কীসে? তা বলি, শোনো...

এসিড বৃষ্টির সাথে লড়াই করতে বা কমাতে হলে আমাদের দূষণকারী পদার্থের ব্যবহার কমাতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানির পোড়ানো কমিয়ে আনতে হবে। তার জন্য আমাদের সবাইকে প্রচারণা করতে হবে। স্কুল, মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববদ্যালয়, মহল্লা, গ্রামে, আশপাশে সবাইকে জানাতে হবে এসিড বৃষ্টির ক্ষতিকর দিক। প্রকৃতিও সুস্থ থাকুক। আমরাও সুস্থ জীবনযাপন করি। ❑

তথ্যসূত্রঃ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়





ক্লাসিক্যাল বনাম কোয়ান্টাম কম্পিউটার

মো. রাকিবুল ইসলাম

আজকের যুগে কম্পিউটার ছাড়া জীবন কল্পনা করা প্রায়ই অসম্ভব। আমাদের পড়াশোনা, বিনোদন, অফিসের কাজ, এমনকি যোগাযোগের ক্ষেত্রেও কম্পিউটার অপরিহার্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এক কথায় বলা যায়, কম্পিউটার আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। আমরা প্রতিদিন যে কম্পিউটার ব্যবহার করি, যেমন- ল্যাপটপ, ডেস্কটপ বা স্মার্ট ফোন সবই আসলে ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন এমন এক নতুন প্রযুক্তির দিকে এগোচ্ছে, যা আমাদের পরিচিত কম্পিউটারের সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে একেবারে নতুন যুগের সূচনা করতে পারে। এই নতুন প্রযুক্তির নাম কোয়ান্টাম কম্পিউটার। কোয়ান্টাম কম্পিউটারকে ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড়ো প্রযুক্তিগত বিপ্লব বলা হয়।

ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার অনেকটা সাধারণ ক্যালকুলেটরের মতো কাজ করে। এটি ছোটো ছোটো সার্কিট আর ট্রানজিস্টরের সাহায্যে বিদ্যুতের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সবকিছু হিসাব করে। এই কম্পিউটারের ভেতরে তথ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয় বিট। বিট মূলত কম্পিউটারের ভাষার অক্ষর। যেমন বাংলা ভাষায় অক্ষর আছে (অ, আ, ক, খ), ঠিক তেমনি কম্পিউটার ভাষার অক্ষর হলো ০ আর ১। প্রতিটি বিট হয় ০ অথবা ১ মানে ধারণ করতে পারে। আমরা যখন কম্পিউটারে ছবি দেখি, গান শুনি বা ইন্টারনেটে সার্চ করি, তখনও আসলে এই ০ আর ১ এর সমষ্টিই ব্যবহার হয়। এক কথায়, ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার একে একে প্রতিটি ধাপ হিসাব করে আমাদের সামনে ফলাফল দেখায়।

অন্যদিকে কোয়ান্টাম কম্পিউটার কাজ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে। এখানে ব্যবহৃত হয় কিউবিট বা কোয়ান্টাম বিট। কিউবিটের বিশেষ ক্ষমতা হলো এটি শুধু শূন্য বা এক নয়, বরং একই সাথে শূন্য এবং এক দুটোই হতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় সুপার পজিশন। এছাড়া কিউবিটের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এনট্যাঙ্গলমেন্ট, যেখানে একাধিক কিউবিট একে অপরের সাথে জড়িয়ে একই সাথে অসংখ্য কাজ করতে পারে। এর মানে, যেখানে একটি ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার একটির পর আরেকটি

কাজ শেষ করে, কোয়ান্টাম কম্পিউটার একই সময়ে লক্ষ লক্ষ জটিল হিসাব সম্পন্ন করতে সক্ষম। এই পার্থক্যটিই কোয়ান্টাম কম্পিউটারকে অসাধারণ করে তুলেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আজকের ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার দিয়ে যদি কোনো বড়ো রাসায়নিক পরীক্ষার হিসাব করতে হয়, তবে সেটা করতে কয়েক বছরও লেগে যেতে পারে। কিন্তু একই কাজ কোয়ান্টাম কম্পিউটার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ করতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এই ক্ষমতা ব্যবহার করে নতুন ওষুধ তৈরির কাজ অনেক দ্রুত করা সম্ভব হবে। যেমন ক্যান্সার বা দুরারোগ্য রোগের ওষুধ খুঁজে বের করতে যে সময় এখন লাগে, কোয়ান্টাম কম্পিউটার তা অনেক কমিয়ে দিতে পারে।

কোয়ান্টাম কম্পিউটারের আরেকটি বড়ো ব্যবহার হতে পারে জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণায়। আমাদের পৃথিবীর আবহাওয়া প্রতিদিন জটিলভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। এর সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটার একই সাথে অসংখ্য তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং খুব নিখুঁতভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হবে। এর ফলে কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ রক্ষায় বিশাল অবদান রাখতে পারবে। এছাড়া মহাকাশ গবেষণায়ও কোয়ান্টাম কম্পিউটার বড়ো ভূমিকা রাখতে পারে। মহাকাশে ভ্রমণ বা নতুন গ্রহের সন্ধান করা খুবই জটিল কাজ। এতে প্রচুর হিসাব, তথ্য ও সঠিক পরিকল্পনার দরকার হয়। ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার এই কাজে অনেক সময় নিলেও কোয়ান্টাম কম্পিউটার মুহূর্তের মধ্যেই জটিল মহাকাশ সমীকরণ সমাধান করে দিতে পারে। ভবিষ্যতে মানুষ যখন অন্য গ্রহে বসবাসের চেষ্টা করবে, তখন এই প্রযুক্তি বিশাল ভূমিকা রাখবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সাইবার নিরাপত্তা। আজকের দিনে আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য, ব্যাংকের ডেটা, এমনকি রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তাও কম্পিউটারের ভেতরে জমা থাকে। ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার নির্দিষ্ট কিছু কোড দিয়ে তথ্যকে সুরক্ষিত রাখে। কিন্তু সেই কোড ভাঙা খুব কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। কোয়ান্টাম কম্পিউটার এত শক্তিশালী যে এটি বর্তমানের সব নিরাপত্তা কোড সহজেই ভেঙে ফেলতে পারবে। আবার একই সাথে নতুন ধরনের আরো নিরাপদ কোড তৈরি করাও সম্ভব হবে। তাই কোয়ান্টাম কম্পিউটার সাইবার সিকিউরিটির ভবিষ্যতকেও সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে। তবে এখানেই শেষ নয়। কোয়ান্টাম কম্পিউটার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

আজকের দিনে যেসব রোবট বা স্মার্ট অ্যাপ্লিকেশন আমরা দেখি, সেগুলো ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার দিয়ে চালানো হয়। কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটার এলে এই প্রযুক্তি আরো উন্নত হয়ে মানুষের চিন্তাভাবনার কাছাকাছি চলে আসবে। অবশ্য কোয়ান্টাম কম্পিউটার এখনো সবার হাতে পৌঁছায়নি। এটি এখনো গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ এবং বানাতে প্রচুর খরচ হয়। একটি কোয়ান্টাম কম্পিউটার চালাতে বিশেষ ধরনের ঠান্ডা পরিবেশ এবং জটিল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। এজন্যই বর্তমানে এটি ব্যবহার করতে পারছে কেবল বড়ো বড়ো গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো। তবে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে এটি সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে যাবে, যেমনটা একসময় ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারের ক্ষেত্রেও হয়েছিল।

ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার আমাদের জীবনে বিপ্লব এনেছিল, কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটার সেই বিপ্লবকে ছাড়িয়ে যাবে। এটি শুধু দ্রুতগামী কম্পিউটার নয়, বরং মানবজীবনের সব জটিল সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়ার নতুন দ্বার। চিকিৎসা থেকে মহাকাশ, আবহাওয়া থেকে নিরাপত্তা প্রায় সব ক্ষেত্রেই এটি নতুন যুগের সূচনা করবে। তাই বিজ্ঞানীরা একে বলছেন 'ভবিষ্যতের প্রযুক্তি বিপ্লব'। হয়ত একদিন আমরা এমন এক পৃথিবীতে বসবাস করব, যেখানে কোয়ান্টাম কম্পিউটার আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গী হয়ে উঠবে, ঠিক যেমন এখন ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার আছে আমাদের ঘরে ঘরে। ❑

শিক্ষার্থী, নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা



কোডিং

হাসান আল শোয়াইব

তারিক মানবিকের ছাত্র ছিল। কিন্তু তার আগ্রহ বিজ্ঞানে। সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং- এর কোডিং। কোডিং দিয়ে পুরো বিশ্বই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এই ভাবনাতে সে রাতদিন বিভোর। পড়ার চিন্তা তার মাথায় একদম না থাকায় জীবনে অনেকবার সে বকা শুনেছে, কখনো স্কুলের স্যারের কাছে, কখনো পরিবারের কাছে। এভাবেই জীবনের ত্রিশটি বছর কেটে গিয়ে আধবয়সি হয়েছে। সারাক্ষণ রুমের মধ্যে চুপিচুপি একমনে কী যে করে। তা দেখে স্ত্রী রেগে যায়, 'তোমার কম্পিউটারে এত কী?'

তারিক কোনোদিন উত্তর দেয়, কোনোদিন দেয় না। ওর একটাই লক্ষ্য, বিশ্বজয় করা। তারিক বলে, 'যেদিন সবাই আমাকে জানবে, সেদিন আর কেউই বকা দিবে না। তুমি বুঝো না।' স্ত্রী বলে, 'ছাই, বুঝতেও চাই নে।'

পুরো রুম কম্পিউটার, মনিটর, ট্যাব, চিপ, তারের কুণ্ডলি ইত্যাদি দিয়ে ভরিয়ে রাখা। অতি উৎসাহী দু-একজন অতিথি এ রুমে উঁকি মারলে বিস্তর তথ্য পায়। মানুষের সাথে তারিকের উঠাবসা কম। ও যুক্তি দেয়, 'এখন আধুনিক যুগ। সর্বত্র বিজ্ঞান। যা হবে বিজ্ঞান দিয়ে।' চা খেয়ে এসে বিল পে করে মোবাইলে। তারিক ভাবে, 'এমন যদি হতো মনে মনে চিন্তা করলেই বিল পে হয়ে যেত! কত ভালো হতো।'

তার এমন চালচলন দেখে কেউ অনাগ্রহ দেখালে তারিক জানায়, সে সংসারী নয়, আবার বৈরাগীও নয়। সে বিজ্ঞান সাধক। জগদীশচন্দ্র বসুর উদাহরণ তুলে ধরে। ছেলে কানাডায় পড়াশোনা করে। মেয়ে স্বামীসহ ফ্রান্সে থাকে। আর তারা থাকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাথেই। ঢাকার নোংরা পরিবেশ দেখে তারিকের ভেতরে ঘৃণা জমে। এখানে-ওখানে আবর্জনা, পলিথিনে বিচ্ছিরি অবস্থা। মাঝে মাঝে পলি-ইথিলিন নিয়ে দু-একটা ইংরেজি প্রবন্ধ বিভিন্ন

জার্নালে প্রকাশ করে। চিন্তা করে, কোডিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে পলিথিন পচানো যাবে।

তারিক দীর্ঘদিন ধরে শহরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল। সে বুঝে গেছে, শহরের বিদ্যুৎ বিতরণ চলে SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) সিস্টেমের মাধ্যমে। সে তার কোডিং স্কিল দিয়ে ধীরে ধীরে এক ধরনের অও-বেইসড ইনফিলট্রেশন সিস্টেম তৈরি করে, যা এই SCADA নেটওয়ার্কে ঢুকে পড়ে। তারিকের ঘরে বসেই এখন একটি স্বতন্ত্র 'ডিজিটাল গ্রিড' চালু, যা সে নিজস্ব সোলার ব্যাটারি থেকে চালায়। তার ভাষায়, 'পুরো শহরের সাবস্টেশনগুলো এখন আমার হাতে। আমি যে কোড লিখেছি, সেটা প্রতিটি পাওয়ার লাইনে কমান্ড পাঠাতে পারে, ঠিক যেমন আমরা ওয়াইফাই অন করি।'

দিনগুলো ভালোই চলছিল। এরই মাঝে বর্ষাকাল আসে। বৃষ্টির প্রকোপে সারা শহর নদীর মতো। রিকশা, ভ্যান কিছুই এগোতে পারে না। সেদিন রাতে কোথাও কোনো ইলেকট্রিসিটি নেই। তিনদিন কেটে গেল, তাও ইলেকট্রিসিটি নেই। জরুরি ভিত্তিতে মেয়র তদন্তের নির্দেশ দিল। পুলিশও উঠেপড়ে লাগল।

তারিক একমনে রুমে বসে স্ত্রী মৌসুমীকে ডেকে বলে: 'গত তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই কেন জানো?'

'আমি কীভাবে জানব!' বলে মৌসুমী চিন্তায় পড়ে যায়।

তারিক বলে, আমি কোডিংয়ে সফল হয়েছি। এখন পুরো শহরের ইলেকট্রিসিটি আমার নিয়ন্ত্রণে। এই বিপুল শক্তিকে আমি কাজে লাগাবো।

তারিক আবার কম্পিউটার খুলে বসল, ইনপুট-আউটপুট, ডেটা প্রসেসিং সবকিছু পর্যবেক্ষণ করল। সবকিছু ঠিক আছে কিনা দেখে নিল। তারপর সে তার পরিকল্পনার খসড়া লেখে—

১. সবার আগে স্কুলগুলোতে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা।

২. বাস্তবায়ন করবে রোড অ্যান্ড রেডিয়েশন প্রকল্প যাতে অনিয়ন্ত্রিত গাড়ি চলবে, কোনো দুর্ঘটনা বা যানজট হবে না। প্রতিটি গাড়িতে থাকবে RFID chip I V2X(Vehicle-to-Everything) Communication System। রাস্তার পাশে বসানো থাকবে AI traffic controller, যা গাড়ির গতি ও দিক পর্যবেক্ষণ করবে।

৩. শহরকে পুরোপুরি স্মার্ট সিস্টেমে রূপান্তর ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বিশ্লেষণ সেন্সর।

৪. ওজোন স্তর রক্ষা ও গ্লোবাল ওয়ার্মিং হ্রাসে একটি Atmospheric Coding Module বানাবে। যা উচ্চমণ্ডলে সিলভার আয়োডিন ছড়িয়ে কৃত্রিম বৃষ্টি ঘটাতে পারবে।

৫. ঘরে বসেই মানুষ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। তারিক BCI (Brain-Computer Interface) প্রযুক্তির সাহায্যে এমন কোডিং করছে যাতে চিন্তা করলেই যন্ত্রপাতি কাজ করবে। ফ্যান, লাইট, দরজা সবকিছু চলবে চিন্তার তরঙ্গে।

তারিক ছয় নাম্বার লিখতে গিয়ে ভাবে তারপর লিখে: মানুষ একদিন বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। চাইলেই সুইচ অন করে পানি আনবে, চাইলে বন্ধ করবে।

পাশে ব্র্যাকেট দিয়ে লেখে, মানুষ একদিন হয়ত এটাও পারবে।

পরদিন সে মৌসুমীকে কোডিং পরীক্ষাটি দেখালো। একটা পলিথিনে চিপ বসিয়ে Thermal Pulse Emission চালু করল। এটি একটি bio-reactive chip, যার ভেতরে লেখা আছে Nano-thermal decomposition algorithm। মাত্র ৩০ সেকেন্ডে পলিথিন গলে গেল। এটি একটি পরিবেশবান্ধব প্রক্রিয়া। তবে ঢাকার সমস্ত পলিথিন গলাতে শক্তি ব্যয় হবে ৩ ট্রিলিয়ন জুল।

তারিক বলে, 'এই প্রক্রিয়াকে বড়ো স্কেলে আনলে শহরের পরিবেশ বদলে যাবে। শিশুরা বড়ো হবে পরিষ্কার ও নিরাপদ পরিবেশে।'

মৌসুমী অভিভূত হয়ে পড়ে। চুপ করে থাকে।

এদিকে পুলিশ এসে যায়। সাথে মেয়রও। সার শহর খুঁজেও কিছু পায়নি বলে তারা তারিকের বাসায় আসে।

মেয়র জিজ্ঞাসা করে, 'আর কে কে থাকেন এখানে?'

মৌসুমী উত্তর দেয়, 'আমি আর আমার স্বামী।'

-নাম কী তার?

-তারিক।

-তিনি কোথায়?

মৌসুমী চুপ হয়ে যায়, ভাবে। বলে, 'ভেতরেই তো ছিলেন।'

পুলিশ রুম সার্চ করে। এমন সময় একটি আসবাব কথা বলে ওঠে- 'তারিককে খুঁজে পাওয়া অত সহজ নয়। আমরা তার রোবট। আমরা থাকতে কেউ তাকে পাবে না।'

মেয়র হতভম্ব। হঠাৎ দরজার বেল বেজে ওঠে। সেখানে কণ্ঠ ভেসে আসে,

'আমি তারিক। সমস্ত ভালো কাজগুলো আমি করব। কেউ বাধা দিতে পারবে না। মানুষকে থামানো যায়, প্রযুক্তিকে নয়! আমি চাই দুর্নীতিমুক্ত, সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ একটি দেশ।'

মেয়রের চোখ লাল হয়ে যায়। সে ভাবে, কী করবে! এখন তো প্রযুক্তিই ক্ষমতা।

আরো গুরুত্ব সহকারে খুঁজতে খুঁজতে তারিককে পুলিশ পেয়ে যায়। তারিক খাটের নিচে বসেছিল। পুলিশ তারিককে হ্যান্ডকাফ পড়ালে মৌসুমি আকাশ থেকে পড়ে, একি হচ্ছে? পুলিশ ও মেয়র তারিককে পাকড়াও করে নিয়ে যাবার সময় একটা সাইরেন বেজে উঠে। তারপর পুরো বাড়িতে কেবল নিস্তব্ধতা। কয়েকদিন পর বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঠিক হলে ঢাকার প্রতিটি টিভি অন করা মাত্রই তারিকের ভিডিও দেখা যেতে লাগল। যেখানে তারিকের রুম হতে ভিডিওটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলছিল, তারিকের কথার সারমর্ম ছিল, পুলিশ যাকে ধরে নিয়ে গেছে সেটা তারিক না।

এটা দেখে ঢাকা শহরে আবার তুলকালাম শুরু হয়ে গেল, তারিক তাহলে কই?

প্রকৃতপক্ষে কোডিং প্রক্রিয়ায় তারিক আরো অনেক আগেই নিজেকে অনু-পরমাণুতে প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। তার স্ত্রীও কোডিং মানবী।

কবি, গল্পকার ও শিক্ষার্থী, শেরপুর সরকারি কলেজ



বিন্দু রহমান, ৫ম শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা



এক্সপেরিমেন্ট রেইনবো

মিলাদ হোসেন সুজন

আজ শুক্রবার, রাফির সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ভীষণ চনমনে স্বভাবের রাফি ক্লাস সেভেনে পড়ে।

দুষ্টুমিতে যেমন সবাইকে ছাড়িয়ে যায় রাফি, ঠিক পড়াশোনায়ও ছাড়িয়ে যায় ক্লাসের সবাইকে।

তাই তো রাফিকে সবাই অনেক স্নেহ করে, আদর করে। রাফিকে ক্লাসের একেকজন একেক নামে ডাকেন, ক্লাসে বিজ্ঞানের শিক্ষক রাফিকে নিউটন বলে ডাকেন। ইংরেজি শিক্ষক লাভলি ম্যাম রাফিকে আইনস্টাইন বলে ডাকেন। আবার গণিতের শিক্ষিকা মজা করে তাকে পিথাগোরাসের নাতি বলে সম্বোধন করেন। রাফি অবশ্য নতুন নতুন নামে নিজেকে সম্বোধন করতে দেখে বেশ আনন্দ পায়। রাফি চায় তাকে সবাই সবসময় নতুন করে চিনুক, নতুন করে জানুক।

রাফিকে এমন গুণী মানুষদের নামে সম্বোধন করার কারণ কি জানো?

এ পর্যন্ত তার সহপাঠী বা শিক্ষক কোনো প্রশ্ন করে রাফির কাছ থেকে যথাযথ উত্তর পাননি এমনটা এখনো ঘটেনি। কারণ রাফি তুখোড় একজন বইপোকা। পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি বড়ো বড়ো বিজ্ঞানের বই পড়ে, আরো পড়ে ইতিহাস, ধর্ম-এবং সংস্কৃতি বিষয়ক বইও। তাই রাফি বিজ্ঞানের শিক্ষকের কাছে নিউটন, ইংরেজি শিক্ষককের কাছে আইনস্টাইন, আর গণিতের শিক্ষকের কাছে পিথাগোরাসের নাতি।

নামগুলো রাফি বই পড়ে বলেই যে পেয়েছে এমনটা নয়। নামগুলো পেতে রাফিকে দিতে হয়েছে অনেক অনেক কঠিন পরীক্ষাও।

যেমন রাফির বিজ্ঞান শিক্ষক ক্লাসে ঢুকেই রাফিকে হুটহাট প্রশ্ন করে বসলেন-

- গাছের পাতা সবুজ হয় কেন?

রাফিরও যেন উত্তর তৈরি করে রাখা।

রাফি ঝটপট বলে দেয় -

-গাছের পাতা সাধারণত ক্লোরোফিলের কারণে সবুজ দেখায়। ক্লোরোফিল হলো এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ যা পাতার মধ্যে থাকে এবং সূর্যের আলো শোষণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে।

রাফির উত্তরে বিজ্ঞানের শিক্ষক অবাক হয়ে যান।

রাফিকে আটকাতে করেন আরেক প্রশ্ন-

- সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ কোনটি?

রাফি সাথে সাথেই বলে উঠে -বৃহস্পতি।

বিজ্ঞানের শিক্ষক সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, দেখেছ, আমাদের নিউটনের অবাক করা উত্তর!

বলতে বলতে তিনি রাফির মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, রাফি বেশ অনুপ্রাণিত হয়।

ইংরেজি শিক্ষক লাভলি ম্যাম ক্লাসে আসলেই সবাই ভয়ে কুপোকাত। কিন্তু রাফির বেলায় ব্যতিক্রম। লাভলি ম্যাম তার প্রিয় টিচার। ম্যামের গুগলি উত্তর রাফির খানিকটা চিন্তা করে দিতে হয় বলে রাফি সব সময় লাভলি ম্যামের প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকে।

শুক্রবার ছুটির দিনে ভোর থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, দুপুরের দিকে ভাগনে বৃষ্টি খানিকটা জিরিয়ে নিতে সূর্যিমামাকে সুযোগ করে দিলো। স্বচ্ছ আকাশে হেসে হেসে সূর্য জেগে উঠল। দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টির পর হালকা আলোর রশ্মি রাফিদের জানালার সামনে আসতেই রাফি জানালা খুলে আকাশে তাকালো।

নীলাভ আকাশ, মাঝেমধ্যে থোকা থোকা সাদা সাদা জমে থাকা মেঘের পাহাড়, আর বৃষ্টিভেজা তরুলতার সবুজাভ হাসি যেন দুপুরকে করে তুলেছে উপভোগ্য।

দুপুরের খাবার খেয়ে হাঁটতে যাবে এমনটাই চিন্তা করল রাফি। বৃষ্টিস্নাত পরিবেশ বুক ভরে উপভোগ করতে কে না চায়। অবশ্য আজকাল মানুষের মধ্যে চারদেয়ালে আবদ্ধ থাকার মানসিকতা ভ্রাতৃত্ববোধের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকাল শিশুরা বিভিন্ন অনলাইন গেমে আসক্ত হয়ে সর্বস্ব হারাচ্ছে, অথচ যে সময়টুকু তারা অনলাইন গেমে বসে কাটাচ্ছে, সে সময়ে অনেক কিছুই শিখতে পারত, জানতে পারত অজানাকে।

রাফি সব সময় মুক্ত পাখির মতো বিচরণ করতে চায়, অজানাকে জানতে চায়, জানাতেও চায়।

যেমন ভাবনা তেমন কাজ, দুপুর গড়ালে রাফি রেডি হয়ে তার প্রিয় সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে প্রকৃতি উপভোগে। মাঝেমধ্যেই সময় বের করে রাফি ঘুরে, একা একাই ঘুরে, একা ঘুরতে একটা তৃপ্তি মিলে, নিজেই নিজের পথ সৃষ্টি করাতে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সে আনন্দ অন্য কোথাও নেই।

রাফি কাজী নজরুল ইসলামের 'আমার পথ' প্রবন্ধের কথা মনে করে সে নিজের আত্মনির্ভরশীলতাকে গুরুত্ব দেয়, সে মনে করে নিজের সত্যই নিজের পথপ্রদর্শক।

রাফি তার প্রিয় সাইকেলটা নিয়ে প্রকৃতি উপভোগ করতে করতে নদীর পাড়ে যায়, নদীর পাড়ের শীতল বাতাস মুগ্ধতার শেষ প্রান্তে নিয়ে যায়, খানিক পরে রাফি সূর্যের বিপরীত আকাশে ভেসে থাকতে দেখে সাতটা রঙের বিশাল আস্তরণ, যেটাকে আমরা রংধনু বলে থাকি। এত বড়ো রংধনু রাফি এই প্রথম দেখল। এর আগে এত বড়ো রংধনু রাফি কোনোদিনও

দেখেনি। বেগুনি, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল রঙের এই রংধনু রাফির মুগ্ধতাকে বাড়িয়ে তোলে এবং রাফিকে বেশ উচ্ছ্বসিত করে তোলে। রংধনুর সাতটা রং মনে রাখতে রাফি কয়েকবার উচ্চঃস্বরে বলতে থাকে- বেনীআসহকলা- প্রত্যেকটা রঙের প্রথম অক্ষর মিলে এই বেনীআসহকলা।

আস্তে আস্তে বিকেল গড়ায়, রাফিও প্রকৃতি উপভোগ করতে করতে ঘরমুখো হয়। কিন্তু রাফির মনে হাজারো প্রশ্ন গেথে থাকে, রংধনু কেন হয়? রংগুলো কীভাবে আলাদা হয়ে থাকে? রংধনু হলে কী হয়? আরো কত কী প্রশ্ন।

রাফি স্কুলে গিয়ে এই প্রশ্নগুলো লাভলি ম্যামকে জিজ্ঞেস করবে এমনটাই ভাবনা তার।



রোববার সকাল সকাল ঘুম ভাঙে রাফির, উঠেই আর্ট পেপারে বড়ো রংধনু আর্ট করে নেয়।

স্কুলে গিয়েই সবাইকে রংধনু দেখিয়ে প্রশ্ন করতে থাকে রাফি।

রংধনু কেন হয়? কীভাবে হয়? এমন প্রশ্নে সবাই দাঁত কামড়ায়, কেউ কেউ কলম মুখে চেপে চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু কেউই ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারে না।

লাভলি ম্যাম ক্লাসে আসলে বেশ কৌতূহল নিয়ে রাফি জানতে চায় প্রশ্নগুলোর উত্তর।

কিন্তু লাভলি ম্যামও যেই সেই নয়। লাভলি ম্যাম সরাসরি প্রশ্নগুলোর উত্তর না দিয়ে রাফিকে একটা গুগলি দিয়ে দেন, গুগলিটা এমন -

‘জলের ফোটায় সূর্যি ডুবে
ছড়ায় রঙের সাত
চিন্তা করো বুদ্ধি করো
চেনাও তোমার জাত’।

রাফির মাথায় কিছু ঢুকে না, তবে সে হেরে যেতে শেখেনি, জিতবে নয়ত শিখবে এমনটাই টার্গেট তার। সে এই চার লাইনের ধাঁধাটা খাতায় লিখে রাখে। লাভলি ম্যাম রাফিকে দিয়েই রাফির উত্তর বলানোর জন্য এমনটা করেছেন, সে ভালো করেই বুঝতে পারে।

রাফি স্কুল শেষে বাড়িতে গিয়ে খুব চিন্তা করে লাইনগুলো নিয়ে। তারপর বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। বার বার ব্যর্থ হয়। আবার চেষ্টা করে আবার ব্যর্থ হয়। আবার চেষ্টা করে। সে অতীতে পড়া কালীপ্রসন্ন ঘোষ-এর লেখা আলোচিত ‘একবার না পারিলে দেখো শতবার’ প্রবাদটির কথা মনে করে চেষ্টা

করতে থাকে।

শেষমেষ সে সফল হয়।

তার কণ্ঠে আলহামদুলিল্লাহ শব্দটি উচ্চারিত হয়।

পরের দিন স্কুলে লাভলি ম্যাম ক্লাসে ঢুকেই রাফিকে প্রশ্ন করে বসলেন, কী খবর মিস্টার আইনস্টাইন, আপনার এক্সপেরিমেন্টের কী খবর? রাফি মুচকি হাসে তারপর বলে- দেখবেন নাকি ম্যাম।

ম্যামের উত্তর- হ্যাঁ, সামনে এসে সবাইকে দেখাও। আমরা সবাই দেখব তোমার এক্সপেরিমেন্ট।

রাফি ব্যাগ নিয়ে ক্লাসে সবার সামনে দাঁড়ায়, ব্যাগ থেকে প্রথমেই একটি আর্ট করা রংধনু বের করে, যেখানে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা 'এক্সপেরিমেন্ট রেইনবো'।

তারপর একটি স্প্রে বোতল নেয়। জানালার পাশে যেদিকে সূর্যের আলো আসছে সেখানে যায়।

বোতলটি জল দিয়ে পূর্ণ করে আলোর মধ্যে জলের কণা স্প্রে করতে থাকলে যখন জলের কণা সূর্যের আলোর মধ্যে দিয়ে যায় তখনই আলোর মধ্যে কয়েকটা রঙের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সে তখন পরিচয় করিয়ে দেয় সেটিই রংধনু। এভাবেই রংধনুর তৈরি হয়।

সকলের বোঝার স্বার্থে রাফি বলতে থাকে-

রংধনু মূলত বৃষ্টির কণা বা জলীয়বাষ্প মিশ্রিত বাতাসের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো যাওয়ার সময় আলোর প্রতিসরণের কারণে সৃষ্টি হয়। সাদা আলো বৃষ্টির কণার মধ্যে প্রবেশ করার পর প্রতিসরিত ও প্রতিফলিত হয়ে বর্ণালীর সৃষ্টি করে, যা রংধনুর সাতটি রঙে অর্থাৎ সংক্ষেপে 'বেনীআসহকলা' হয়ে আমাদের চোখে ধরা দেয়।

রাফির এমন কাজ লাভলি ম্যাম বেশ উপভোগ করেন এবং সাথে সাথে সকলে রাফিকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানায়। তারপর লাভলি ম্যাম রাফিকে পুরস্কৃত করে বলেন- Good experiment Rafi, You are a great boy. You are our future scientists. অনেক বড়ো হও রাফি অনেক বড়ো হও। ❑

শিশুসাহিত্যিক



বিজ্ঞান

কোমল দাস

বিজ্ঞান তুমি দিয়েছো অনেক কিছু,
তোমার পরশে সবকিছু বিকশিত।
তুমি ছাড়া ধরা আগে ছিল খুব নিচু,
আধুনিকায়নে তুমিই মেখেছ ঘৃত।

কম্পিউটার পেয়েছি তোমার দানে,
তোমার দানেই পেয়েছি গো বিদ্যুৎ।
ওষুধ এনেছ রোগ-শোক অবসানে,
জাদুর মতোন সব যেন অদ্ভুত!

আরও কতকিছু এনেছ জগতে তুমি,
সত্যি বলতে তুমি যেন অবতার।
তাই তো তোমাকে দিয়ে শ্রদ্ধার চুমি,
সালাম জানাই অগণিত কোটিবার।

তোমাকে দিয়েই জিতেছি আমরা ধরা,
দেখেও এসেছি আকাশের ওই চাঁদ।
মন তাই বলে চোখ করে ছানাবড়া!
বিজ্ঞান তুমি শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।

গল্প



মিমোসার ‘মাংকি-ম্যান’

আশরাফ পিন্টু

কোত্থেকে এক বানর এসে জুটল মিজান সাহেবের বাড়িতে। এ অঞ্চলে কোনো বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বত নেই। তার ওপর শহর এলাকা। কাজেই বন্য পশুর দেখা মেলা ভার। অনেকের ধারণা– কোনো সার্কাসের বানর হয়ত লোকালয়ে পালিয়ে এসেছে।

বানরটি দেখতে সচরাচর বানরের মতো নয়, গায়ের রংও কালো– অনেকটা হনুমান সদৃশ। বানরটি হনুমানের মতোই লম্বা এবং দু’পায়ে ভর দিয়ে চলাফেরা করে।

বানরটি প্রথমে মিজান সাহেবের ব্যালকনির গ্রিল ধরে বসেছিল। মিজান সাহেবের ক্লাস থ্রি পড়ুয়া মেয়ে মিমোসা বানরটিকে দেখে দৌড়ে এসে ওকে একটি পাকা কলা খেতে দেয়। বানরটি হাত বাড়িয়ে কলাটি নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে খেতে থাকে। এমন দৃশ্য দেখে মিমোসা চিৎকার দিয়ে ওঠে, এ তো মানুষের মতোই কলা খাচ্ছে! শুধু খাওয়া নয়, বানরটি দেখতেও অনেকটা মানুষের মতো। তাই মিমোসা ওর নাম দেয়– ‘মাংকি-ম্যান’।

এরপর থেকেই মাংকি-ম্যান মিমোসার খেলার সাথি হয়ে যায়। শুধু স্কুলের সময়টুকু বাদে বাকি সময় মাংকি-ম্যান মিমোসার সাথে সাথে থাকে। খেলার সময় মিমোসা ওকে বিভিন্ন কথা বলে দিক-নির্দেশনা দেয়। কিন্তু মাংকি-ম্যান সেসব কথার জবাব না দিয়ে অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

মিমোসা একদিন লক্ষ করে মাংকি-ম্যান কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে। মিমোসা উৎফুল্ল হয়ে বলে, কিছু বলবে তুমি?

মাংকি-ম্যান কিছু একটা শব্দ উচ্চারণ করে কিন্তু মিমোসা তা বুঝতে পারে না। মিমোসা খুশিতে এক দৌড়ে বাবার কাছে চলে যায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, আব্বু, আব্বু, আমার মাংকি-ম্যান কথা বলছে।

মিজান সাহেব কলেজে যাবার জন্য রেডি হচ্ছিলেন। তিনি ওর কথায় কান না দিয়ে বরং কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলেন, সারাদিন শুধু মাংকি-ম্যান! মাংকি-ম্যান! তুমি এখনো রেডি হওনি কেন? যাও। জলদি রেডি হয়ে নাও।

মিমোসা মন খারাপ করে চলে যায়। মিজান সাহেব ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন– সোয়া ন'টা বেজে গেছে। তিনি মিমোসাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

মিজান সাহেব একটি সরকারি কলেজের জীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। তিনি ক্লাস শেষ করে অবসর সময় ল্যাবরেটরিতে কাটান। সেদিনও ক্লাস শেষ করে ল্যাবে ঢুকে দেয়ালে টাঙানো প্রাণিজগতের বিবর্তনের ছবি দেখছিলেন। হঠাৎ জানালার দিকে তাকাতেই নজরে পড়ে– জানালার গ্রিল ধরে ঝুলে আছে মাংকি-ম্যান।

মাংকি-ম্যানকে দেখে অজান্তেই তিনি বলে ফেলেন, আরে মাংকি-ম্যান! তুমি এখানে?

প্রতি উত্তরে মাংকি-ম্যান বলে, আপনাদের ল্যাব দেখতে এলাম।

মাংকি-ম্যানের মুখে মানুষের মতো কথা শুনে মিজান সাহেব কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। মনে মনে ভাবেন– তাহলে মিমোসার কথাই ঠিক। ও তো কথা বলতে পারছে। মিজান সাহেব জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যতটুকু জানেন– বানর জাতীয় প্রাণীরা মানুষের কথা বুঝতে পারলেও তাদের কথা বলার কোনো ক্ষমতা নেই। তাদের মানুষের মতো স্বরযন্ত্র রয়েছে। কথা বলার মতো সব রকমের ব্যবস্থা থাকলেও তারা কথা বলতে পারে না। কারণ– তাদের মস্তিষ্কে 'রাইটিং ওয়ারিং' সাধনের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু মাংকি-ম্যান কথা বলছে কীভাবে?

– কী ভাবছেন? দেখাবেন না আপনার ল্যাব?

– তা দেখাবো। কিন্তু আমি ভাবছি তুমি কথা শিখলে কোত্থেকে?



– তা পরে বলছি। তার আগে আমি জানতে চাচ্ছি বিবর্তন নিয়ে আপনাদের ধারণা কতটুকু?

– এটা এখনো তাত্ত্বিক বিষয়। পুরোপুরি প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

– আপনারা কি তা বিশ্বাস করেন?

– কেউ করে, কেউবা করে না।

– কেন?

– আগেই তো বললাম– এটা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। একটু থেমে মিজান সাহেব এবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকান মাংকি-ম্যানের দিকে। এরপর বলেন, কিন্তু তুমি এ ব্যাপারে জানতে চাচ্ছো কেন?

মিজান সাহেবের কথায় মাংকি-ম্যান এবার মৃদু হাসে। হাসিটি তার কাছে মানুষের মতো রহস্যময় মনে হয়। উত্তরের অপেক্ষায় ওর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মিজান সাহেব।

কিছুক্ষণ পর মাংকি-ম্যান বলে, এর সাথে আমার একটা সম্পর্ক আছে।

– বুঝলাম না।

– আমি আপনাদের আদি পুরুষদের একজন।

মিজান সাহেব এবার কী বলবেন ভেবে পান না। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মাংকি-ম্যানের দিকে।

– বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি সুদূর অতীত থেকে টাইম ট্রাভেল করে এসেছি।

– তা কী করে সম্ভব? এখনো তো...

– পৃথিবীর হিসেবে আমরা পাস্ট ওয়ার্ল্ডের বাসিন্দা। পৃথিবী অর্থাৎ থ্রি-ডাইমেনশনের বাইরে পাস্ট-ফিউচার বলে কিছু নেই– সবই প্রেজেন্ট অর্থাৎ বর্তমানকাল; সে কাল অনন্ত– যার কোনো শেষ নেই।

মিজান সাহেব মাংকি-ম্যানের কথার কী উত্তর দেবেন ভাবতে থাকেন। কিছু একটা বলতে যাবে এমন সময় দরজার দিকে তাকিয়ে দেখেন বেয়ারার সিয়াম আলি। ওর মুখখানা শুকনো। ও বলে, স্যার, হিমাগার থেকে একটি হনুমানের মমি কে যেন নিয়ে গেছে।

সিয়াম আলির কথা শোনার পর মিজান সাহেব পুনরায় জানালার দিকে তাকাতেই দেখেন মাংকি-ম্যান ওখানে নেই। মিজান সাহেব ভাবেন– হয়ত ও বাড়ি চলে গেছে।

বাড়ি এসে মিজান সাহেব মাংকি-ম্যানের কথা জিজ্ঞেস করতেই মিমোসা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে, স্কুল থেকে এসে দেখি মাংকি-ম্যান কোথায় যেন চলে গেছে। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও গবেষক

খ্যাতির পাতায় লেখা

নীহার মোশারফ

টমাস আলভা এডিসনের
আবিষ্কারের ধারায়
রঙিন রঙিন বাতি জ্বলে
শহর বন্দর পাড়ায়।

ইতিহাসে বিজ্ঞানী এক
খ্যাতির পাতায় লেখা
দেশে দেশে তার অবদান
সবখানে যায় দেখা।

শ্রমে, ত্যাগে ওঠেন বেড়ে
উদ্ভাবনের নেশায়
বিশ্বজুড়ে শ্রেষ্ঠ হলেন
গবেষণার পেশায়।



আধুনিক খোকা

মাহ্‌মূদ বিক্রম

খোকা কত আধুনিক;
কম্পাসে দেখে দিক;
ফুল নিয়ে পাখি নিয়ে গবেষণা করে।
বুদ্ধিটা পাকা তার;
ঠিক যেন ক্ষুরধার;
নিরিবিলি পাঠাগারে মোটা বই পড়ে।

খোকা কত প্রাণবান;
সব কাজে আগুয়ান;
জীব নিয়ে জড় নিয়ে শত কিছু ভাবে।
স্বপ্নটা বড়ো তার;
আগামীতে কোনোবার;
মহাকাশযানে চড়ে ভিনগ্রহে যাবে।

বায়োসিকিউরিটি ফেলোশিপ অর্জন মারজানা'র

মেজবাউল হক



বাংলাদেশের তরুণ গবেষক মারজানা আক্তার অর্জন করেছেন এক ঐতিহাসিক স্বীকৃতি। তিনি নির্বাচিত হয়েছেন জাতিসংঘের 'ইয়াং উইমেন ফর বায়োসিকিউরিটি ফেলোশিপ-২০২৫'- প্রোগ্রামে বাংলাদেশ থেকে প্রথম নারী গবেষক হিসেবে। বিশ্বব্যাপী ১৯৩টি দেশের মধ্য থেকে মাত্র ১০জন তরুণী গবেষক এ বছরের ফেলোশিপে স্থান পেয়েছেন, তাদের মধ্যেই রয়েছেন মারজানা। তবে এ সাফল্যের পেছনের গল্পটা শুধুই মেধার নয়, এটি ছিল অধ্যবসায়, সাহস আর ভালোবাসার গল্প।

কলেজে জীববিজ্ঞান ক্লাসে মাইক্রোস্কোপে প্রথম কোষ দেখেন মারজানা আক্তার। মুহূর্তে তাঁর চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠে কাচের স্লাইডের নিচে থাকা ক্ষুদ্র একটা জগৎ। তখন হয় তো ভাবতেও পারেননি, মাইক্রোস্কোপে দেখা কোষ থেকে শুরু হওয়া তাঁর যাত্রা জাতিসংঘের বায়োসিকিউরিটির বৈশ্বিক মঞ্চে গিয়ে থামবে। ছোটো শহরে বেড়ে ওঠা মারজানা সব সময়ই ছিলেন কৌতূহলী।

বিজ্ঞানের বই, জীববিজ্ঞানের গল্প সবকিছুতেই ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। জীবনের একেবারে আণবিক পর্যায়ের রহস্য বোঝার ইচ্ছা থেকেই বেছে নিয়েছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সাস্ট) বায়োকেমিস্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজি বিভাগ। সেখানেই প্রথম উপলব্ধি করেন, প্রতিটি প্রোটিন ও জিন, এনজাইম একেকটি গল্প বলে। এই গল্প বুঝতে হলে ল্যাবই সবচেয়ে বড়ো শিক্ষক। সেই ভাবনা থেকেই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রো বায়োলজিতে স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন শুরু করেন। এখানে জীবাণু, ভাইরাস ও রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি কাজ করার সুযোগ পান মারজানা।

জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণবিষয়ক দপ্তর

> বায়োসিকিউরিটি (Biosecurity) হলো এমন একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যা মানুষ, পশু, গাছপালা এবং পরিবেশকে রোগজীবাণু, কীটপতঙ্গ ও ক্ষতিকর জীবাণু থেকে রক্ষা করে, মূলত খামারে বা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সেগুলোর প্রবেশ, বিস্তার ও সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। এটি কাজ করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং কঠোর প্রটোকল (যেমন- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ, কোয়ারেন্টাইন) প্রয়োগের মাধ্যমে। এজন্য আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে, তাহলো ফার্মে প্রবেশ সীমিত করা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, নতুন প্রাণী বা উদ্ভিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা করা এবং নিয়মিত জীবাণুমুক্তকরণ নিশ্চিত করা, যা একটি খামারকে লাভজনক রাখতে ও রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে অপরিহার্য।

জীববৈজ্ঞানিক অস্ত্রবিরোধী চুক্তির (Biological Weapons Convention) ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই ফেলোশিপের আয়োজন। এর মূল লক্ষ্য– জীববিজ্ঞানের জ্ঞান ও গবেষণাকে মানবকল্যাণে ব্যবহার এবং বায়োসিকিউরিটি বিষয়ে বৈশ্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি। এই ফেলোশিপের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ডিসেম্বরে, সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। সেখানে বিশ্বের শীর্ষ গবেষক, বিজ্ঞানী ও নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে এক মঞ্চে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন মারজানা– যা দেশের জন্য এক গর্বের মুহূর্ত।

মারজানা সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইক্রোবায়োলজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এর আগে তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সাস্ট) থেকে বায়োকেমিস্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজিতে স্নাতক সম্পন্ন করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল বাংলাদেশের পোলট্রিতে চিকেন ইনফেকশাস অ্যানিমিয়া ভাইরাস (CIAV), যেখানে তিনি দেশের প্রথম জেনোটাইপ ৩বি স্ট্রেইন শনাক্ত করেন। তার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড হাইজিন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. গোলজার হোসেন, যিনি পুরো যাত্রায় তাকে একাডেমিক ও মানবিকভাবে সহযোগিতা করেছেন।

গবেষণার সময় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালেও ভর্তি ছিলেন। শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মধ্যেও মারজানা গবেষণার কাজ থামাননি। সেই সময়েই তার ল্যাব নির্বাচিত হয় জাপান সরকারের অর্থায়নে সাকুরা সায়েন্স এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম-এর জন্য। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি সেই সফরে অংশ নিতে পারেননি। কিছুদিন পর তিনি নিজের থিসিস সম্পন্ন করেন এবং সফলভাবে গবেষণা শেষ করেন। অল্প বয়সেই মারজানার ৯টি আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার গবেষণার মূল ক্ষেত্র ভাইরোলজি, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) এবং সংক্রামক রোগ বিষয়ক।

বিজ্ঞান

সুমাইয়া জান্নাত

বিজ্ঞান থেকে শিখি আমরা
চারপাশের অনেক জ্ঞান
প্রতি ক্ষণে নতুন কিছু
রাখে অনেক অবদান।

চাঁদ তারা আর গ্রহগুলো
ঘোরে নিজের পথে
বিজ্ঞান শেখায় সত্য কথা
চলে তারা নিয়ম মতে।

চুম্বক টানে লোহার টুকরো
কত যে মজার খেলা
বাতি জ্বলে বিদ্যুতে তাই
আলোর ঝলক মেলা।

দশম শ্রেণি, খিলগাঁও মডেল হাই স্কুল, ঢাকা

মজার বিজ্ঞান

তৌফিক আলম

বিজ্ঞান শেখায় ছবি তোলা
গান বাজানো হয় যন্ত্রে
আরো শেখায় পৃথিবী
ঘোরে নিজের অক্ষ কেন্দ্রে।

বিজ্ঞান মানে মজায় ভরা
দুনিয়ার কত রং
চুম্বক টেনে নেয় লোহা
দেখে লাগে অনেক ঢং

বাতাস নেই তবুও
উড়ে রকেট মহাকাশে
নিচ থেকে তা দেখে খুকু
খুশিতে যায় মন ভেসে।

রংধনুর সাতটা রং
বৃষ্টি এলেই যায় দেখা
আলো ছাড়া দুনিয়ার
সবই হতো যে ফেঁকা।

দ্বিতীয় বর্ষ, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়



শিশু-কিশোরদের যত্ন

পুষ্টিবিদ লিনা আকতার

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহে আমাদের শরীর সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। খাবারের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয় বড়ো থেকে ছোটো সকলের। শিশু-কিশোরদের অবস্থা আরো নাজুক দেখা দেয় গরমকালে। কারণ তাদের শরীর বড়োদের তুলনায় রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। এসময় অনেকই বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত হতে দেখা যায়। যেমন- পানিস্বল্পতা, প্রস্রাবে সংক্রমণ, হিট স্ট্রোক, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, আমাশয়, গরমজনিত সর্দি-কাশি, জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও জন্ডিস। তাই গরমে শিশু-কিশোরদের সুস্থ থাকতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে। জেনে নেই গরমে শিশু-কিশোরদের খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করব-

বিশুদ্ধ পানি ও তরল জাতীয় খাবার: তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে শিশু-কিশোরদের পরিপাকতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। এতে শরীরে ডিহাইড্রেশন ও পুষ্টির ঘাটতি দেখা দেয়। কিশোর-কিশোরীরা পানির চাহিদা বলতে পারলেও শিশুরা অনেক সময় পানির চাহিদা বলতে পারে না। এজন্য শিশু সারাদিনে কতটুকু পানি ও তরল খাবার গ্রহণ করছে তা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। যেসব শিশুরা স্কুলে যায় তারা স্কুলে কী ধরনের খাবার নিয়ে যাবে এবং স্কুল থেকে ফিরে তরল খাবার গ্রহণ করছে কি না খেয়াল করতে হবে। তা না হলে শিশু সহজেই পানিস্বল্পতা বা ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকিতে থাকবে। এই সময় শিশুকে বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতে হবে বেশি করে। এছাড়া কিশোর-কিশোরীরা আজকাল পানির চাহিদা পূরণে কোল্ড ড্রিংকস ও প্যাকেটজাত জুস গ্রহণ করছে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এসব জুসে কৃত্রিম রং ও প্রিজারভেটিভ দেওয়া থাকে, যা বাচ্চাকে ভুলেও খাওয়ানো যাবে না। এর পরিবর্তে ঘরে তৈরি বিশুদ্ধ পানির পাশাপাশি ডাবের পানি, লেবুর শরবত, বেলের শরবত, যে-কোনো ফলের রস খেতে পারে। মনে রাখব অতিরিক্ত চিনি দিয়ে জুস খাওয়ানো যাবে না।

সহজপাচ্য খাবার: গরমের সময় শিশুরা প্রচুর ছোটাছুটি ও দৌড়ঝাঁপ করে, কিশোর-কিশোরীরা স্কুলে, প্রাইভেট পড়তে যায়। এর ফলে তাদের শরীরে প্রচুর ঘাম হয়। এ সময় ভারী, গুরুপাক খাবার না দিয়ে সহজপাচ্য খাবার দিলেই ভালো হয়। নরম সবজি খিচুড়ি কিংবা সবজি বা চিকেন স্যুপ দিতে পারি। এতে শিশু-কিশোররা হজমের সমস্যা থেকে রক্ষা পাবে এবং মেটাবলিজম শক্তি বাড়বে।

তাজা শাকসবজি: গরমের সময় সাধারণত ফুড পয়জনিং, ডায়রিয়া, আমাশয়, বদহজম, টাইফয়েড

হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। কারণ গরমে খাবার দ্রুত পচন ধরে। তাই শিশু-কিশোরদের খাবার সব সময় তাজা এবং সতেজ থাকতে হবে। তাজা শাক-সবজি গরমে খেলে যেমন পরিপাকতন্ত্র ভালো থাকবে তেমনি গরমে শরীরের তাপমাত্রা কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে। সবুজ শাক-সবজিতে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ পানি থাকে। সবজি খুব সহজেই হজম হয়। এজন্য মৌসুমি রসালো সবজি যেমন– লাউ, পেঁপে, ঝিঙ্গা, পটল, চিচিঙ্গা এসব সবজি শিশু-কিশোরদের বেশি করে খেতে হবে। এটি শরীর ঠান্ডা রাখতে ও রুচি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। তবে মনে রাখব রাস্তায় খোলা পরিবেশে বানানো আখের রস, লেবুর শরবত, অ্যালোভেরার জুস, চিনি দেওয়া বিভিন্ন ফলের রস না খাওয়াই ভালো। এতে ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েডসহ নানা রকম শারীরিক সমস্যা হতে পারে।



মাছ: গরমে প্রোটিনের চাহিদা পূরণে নিয়মিত মাছ খেতে পারে শিশু-কিশোররা। মাছ প্রকৃতির শীতল প্রাণী- যা শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। মাছের সঠিক গুণাগুণ পেতে খুব কড়া করে ভাজা থেকে বিরত থাকব। এছাড়া এই গরমে পাতলা ডাল খেতে পারে শিশু-কিশোররা।

মৌসুমি ও সাইট্রাসযুক্ত ফল: গরমে তরলের চাহিদা ও ভিটামিন, মিনারেলস এর চহিদা পূরণে দারুণ কাজ করে মৌসুমি ফল। গরমে তরমুজ, আম, লিচুর পাশাপাশি বেশি করে খেতে হবে সাইট্রাসযুক্ত ফল। কারণ এতে ক্যালরি কম ও পানির চাহিদা পূরণে দারুণ কাজ করে। মৌসুমি ফল শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্টযুক্ত খাবার: এসময় অ্যান্টিঅক্সিডেন্টযুক্ত ও বেরিজাতীয় খাবার যেমন- টমেটো, তরমুজ, পেয়ারা জাতীয় খাবার শিশু-কিশোরদের গ্রহণ করতে হয় বেশি। কারণ এগুলোতে পানি থাকে বেশি। এসব ফলে থাকা অ্যালকাইন শরীরের তাপ নির্গমনে সহায়তা করে।

ফাস্টফুড পরিহার করা: শিশু-কিশোরদের আজকাল ফাস্টফুড খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। বাসায় তৈরি খাবার খেতে অনীহাবোধ করছে। কারণ ফাস্টফুড জাতীয় খাবার বেশি খেলে শিশুদের দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি হতে পারে। গরমকালের পাশাপাশি যে-কোনো সময় ফাস্টফুড থেকে তাদের দূরে রাখা প্রয়োজন।

টিপস

গরমে শিশু-কিশোরদের খাবারের পাশাপাশি তাদের শরীরে আরও কিছু যত্নের দিকে মনোযোগ রাখতে হবে। যেমন-

- ❑ গরমে শিশুদের পোশাক সুতি, ঢিলেঢালা ও হালকা রঙের যেন হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে অভিভাবকদের।
- ❑ অতিরিক্ত গরমে শিশুদের ঘরের বাহিরে যেতে দেওয়া যাবে না এবং অতিরিক্ত রোদে খেলাধুলা করা থেকে বিরত রাখতে হবে।
- ❑ ঘরবাড়ি পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা।
- ❑ সবসময় খাওয়ার আগে শিশু-কিশোরদের হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- ❑ শিশুকে টাটকা ও ফ্রেশ খাবার দিলে শিশু- কিশোরা রোগের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাবে।

পুষ্টিবিদ, রাইয়ান হেলথ কেয়ার হসপিটাল এন্ড রিসার্চ সেন্টার, দিনাজপুর

ভাগ্যবান কৃষক

ওয়াহিদ মুস্তাফা

এক ছিল গ্রাম। সেই গ্রামেরই একজন কৃষক। তার বয়স পঁচিশ বছর। সে এতিম, তার মা-বাবা কেউ নেই। তার একজন বড়ো ভাই ছিল, কিন্তু কিছুদিন আগে সেও মারা গেছে।

তখন পাটের মওসুম। সে পাটের জমিতে গেছে সার দিতে। মাঠে সে যখন সার দিচ্ছিল, তখন তার পায়ে কিছু বাধল। সে নিচে তাকিয়ে দেখে একটা প্রদীপ। প্রদীপটা দেখতে খুব পুরাতন। সেটা সে তুলে নিজের কাছে রেখে দিল। বাড়ি এসে সে প্রদীপটা যত্ন করে তার বিছানার পাশে রেখে দিল।

কিছুদিন পরে সে মাঠে যায় পাট কাটতে। সে দেখতে পায় তার অন্য সহকর্মীরা কেউ আসেনি। তাকেই একা সব পাট কাটতে হবে। আবার সে তার মালিকের কাছ থেকে আরেক দিন সময়ও চাইতে পারছে না। সময় চাইলে হয়ত তাকে কাজ থেকে বাদ দিয়ে দেবে। তাই সে সন্ধ্যা পর্যন্ত একাই সব পাট কাটল।

সন্ধ্যায় সে মালিকের কাছে গিয়ে মজুরি চাইলে তাকে একজনের মজুরিই দেওয়া হয়। তখন কৃষক বলল যে, অন্যরা কেউ আজ আসেনি, সে একাই সব পাট কেটেছে। মালিক তার কথা তো বিশ্বাস করলই না, উল্টো তাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিল। সে বাড়ি গিয়ে মনের দুঃখে তার সেই কুড়িয়ে পাওয়া প্রদীপটা আছাড় মেরে ফেলে দিলে। তখন ঘটল এক আজব কাণ্ড। পুরো ঘর নীল ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সেই ধোঁয়ার মধ্য থেকে এক অচেনা কণ্ঠ বলল– যা ইচ্ছা আদেশ করুন হুজুর।

সে প্রথমে মনে করে , আজ খুব বেশি পরিশ্রম হয়েছে। তাই বোধ হয় মাথা বিগড়ে গেছে; উল্টাপালটা শুনছি। এই ভেবে কৃষক ছেলেটি যেইনা ঘুমানোর জন্য শুয়েছে, অমনি আবার সেই অচেনা কণ্ঠস্বর– যা ইচ্ছা আদেশ করুন হুজুর। কৃষক বিরক্ত হয়ে বলল– আপনি কে! কেন আমাকে বিরক্ত করছেন! আপনি চলে যান! তখন সেই নীল ধোঁয়া ও অচেনা কণ্ঠ গায়েব হয়ে গেল।

পরের দিন সেই কৃষক গ্রামের এক জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে রাতের ঘটনা সব খুলে বলল। সব শুনে জ্যোতিষী বলল– অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য তোমার মাথা বিগড়ে গিয়েছিল, তাই ওসব শুনেছ।

জ্যোতিষীর কথা ভাবতে ভাবতে সে বাড়ি এল। বাড়ি এসে ভাবল– আচ্ছা, প্রদীপটা আবার আছাড় মেরে দেখি তো কী হয়। সে প্রদীপটা আছাড় মেরে ফেলে দিল। আর সাথে সাথে পুরো ঘর নীল ধোঁয়ায় ভরে গেল। সেই অচেনা কণ্ঠ আবার বলল– যা ইচ্ছা আদেশ করুন হুজুর।

এবার কৃষক বুদ্ধি করে বলে– আমাকে দুটি রুটি আর একটি সাগর কলা এনে দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে। আর কী আশ্চর্য! কথা শেষ হওয়ার আগেই খাবার হাজির– গরম গরম দুটি রুটি আর পাকা একটা সাগর কলা। তারপর নীল ধোঁয়া ও অচেনা কণ্ঠ গায়েব। এবার কৃষক বিশ্বাস করে– অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তার মাথা বিগড়ে যায়নি। সত্যি এমন কিছু পেয়েছে, যা সবাই পায় না। ❑

সপ্তম শ্রেণি, বাঘারপাড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর



হারিয়ে গেল জোনাকি পোকা

গ্রাম-বাংলার মানুষের শৈশবের স্মৃতির সাথে জড়িয়ে আছে জোনাকি পোকা। এক সময় অদ্ভুত মায়াবি এক আলোর খেলায় জ্বলজ্বলে থাকত চারপাশ। রাতের আঁধারে এখনো কি আমরা সেই আলোর ঝলকানি দেখতে পাই? না পাই না।

পৃথিবীতে কিছু প্রাণী আছে যারা নিজেদের আলো নিজেরাই তৈরি করতে পারে। তাদের Bioluminescent বলা হয়। জোনাকি পোকা তাদেরই গোত্রের। এর ইংরেজি নাম লাইটেনিং বাগ বা ফায়ার ফ্লাই। জোনাকির আলো পৃথিবীর সবচেয়ে বিশুদ্ধ আলো। তবে এদের পাখায় কোনো আলো থাকে না। আলো জ্বলে এদের পেটের পিছনের দিকে আর লেজের অংশে। হলুদ, সবুজ আর হালকা লাল রঙের আলো। বলো তো বন্ধুরা, জোনাকি আলো পায় কোথা থেকে? এদের দেহে থাকে লুসিফেরিন ও লুসিফারেজ নামের উপাদান। লুসিফেরিন অক্সিজেনের সাথে মিশে আলো উৎপাদন করে। লুসিফারেজ হলো এক ধরনের এন্‌জাইম যা বিক্রিয়ার মাধ্যমে আলোকশক্তি নির্গত করে। আলো তৈরির এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় জৈব আলোক ধারা। বিজ্ঞানীরা জোনাকির এ আলোকে বলেন কোল্ড লাইট বা ঠান্ডা আলো। কারণ এই আলোর কোনো তাপ নেই। এখানে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় তা প্রায় শতভাগই আলো তৈরি করে। এ পোকার এনার্জি সেভিং ক্ষমতা টিউবলাইটের চেয়ে অনেক বেশি। দেখতে সুন্দর লাগলেও জোনাকি কিন্তু প্রকৃতির শোভা বাড়াতে রাতে আলো জ্বালে না। তারা এটা করে মূলত আত্মরক্ষার জন্য বা শিকারি প্রাণীকে ভয় দেখানোর জন্য। তাছাড়া স্বজাতি চেনার কাজেও আলো লাগে। জোনাকিরা আলোক সংকেতের মাধ্যমে তাদের ভাব বিনিময় করে। সেই অর্থে আলোই হলো তাদের ভাষা। অপরূপ জোনাকি নিয়ে বেশ কয়েকটি দেশে আছে নানা আয়োজন, যা দেখতে যায় বিভিন্ন পর্যটকেরা। এক সময় বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতেই মিটিমিটি আলোর মোহে অনেকেই মুঠোয় বন্দি করত জোনাকি। কেউবা কাচের বয়ামে ভরে সে আলো ধরে রাখতে চাইত। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা কি এখনো জোনাকির পিছু নেয়? হাতে নিয়ে আবার উড়িয়ে দেয়? কোথায় যেন হারিয়ে গেছে রাতের মেঠো পথের সেই আলোকচ্ছটা। নগরায়ণের প্রভাবে বাড়তি আলো, নদী ও বায়ু দূষণ, গাছপালা কাটা আর জমিতে কীটনাশকের ব্যবহার ও বাসস্থানের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে সবই। সন্ধ্যা নামলেই তাই আর এখন আলোর মশাল জ্বেলে জোনাকিরা আসে না।



সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বাংলাদেশের বিরল স্থান

ভাবতেই অবাক লাগে, বিশ্বের মানচিত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ, বিরল এবং মহাজাগতিক তাৎপর্যপূর্ণ স্থান আমাদের এই বাংলারই এক শান্ত গ্রামে লুকিয়ে আছে। এটা শুধু বাংলাদেশের একটা সাধারণ জায়গা নয়, এটা পৃথিবীর বিরলতম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক স্থানগুলোর একটা!



এই স্থানটা কর্কট ক্রান্তি রেখা (Tropic of Cancer, 23.5° উত্তর অক্ষাংশ) এবং ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমারেখার (90° East Meridian) একেবারে সঠিক ছেদবিন্দু (Intersection Point)। পৃথিবীর মানচিত্রের এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ কাল্পনিক রেখা ঠিক এই বিন্দুতেই একে অপরকে অতিক্রম করেছে এ বিরল স্থানটি ফরিদপুরে। গ্রাম: ভাংগারদিয়া, ইউনিয়ন: নুরল্ল্যাগঞ্জ, থানা: ভাংগা।

পৃথিবীতে কর্কট ক্রান্তি এবং মকর ক্রান্তি রেখা মূল চারটা দ্রাঘিমারেখাকে (0°, 90° পূর্ব, 90° পশ্চিম এবং 180°) ছেদ করে। কিন্তু সেই বিন্দুগুলোর প্রায় সবগুলোই পড়েছে মহাসাগর বা দুর্গম মরুভূমির (যেমন: সাহারা মরুভূমি) বুকে, যেখানে সাধারণ মানুষের পক্ষে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব।

ফরিদপুরের ভাঙা উপজেলার এই স্থান সম্ভবত বিশ্বের একমাত্র ছেদবিন্দু, যা স্থলভাগে, সবুজ শ্যামল পরিবেশে এবং এত সহজগম্য একটা জায়গায় অবস্থিত। এইদিক থেকে এটা এক কথায় অনন্য!

এই স্থানটার আরও একটা অবিশ্বাস্য দিক হলো, বছরের একটা বিশেষ দিনে এখানে কোনো ছায়া পড়ে না! প্রতি বছর ২১ জুন (Summer Solstice বা কর্কট সংক্রান্তি), ঠিক দুপুরবেলা সূর্য যখন একদম মাথার ওপর আসে, তখন এই বিন্দুতে দাঁড়ানো কোনো মানুষ বা বস্তুর কোনো ছায়া মাটিতে পড়ে না। এই ঘটনাকে 'Zero Shadow Day' বা ছায়াহীন দিবস বলা হয়।

শাহানা আফরোজ



সুহাইবা সেলিম, একাদশ শ্রেণি, বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা



তাসকিন আহমেদ হামীম, তৃতীয় শ্রেণি, এম এ খান আইডিয়াল একাডেমি, দেবিদ্বার, কুমিল্লা



মারিয়া আক্তার, অষ্টম শ্রেণি, একরামুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রামপুরা, ঢাকা



সুমাইয়া আক্তার মিম, তৃতীয় শ্রেণি, আইডিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-50, No-3. September 2025, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022



সিরাজুম মুনিরা বিভা, তৃতীয় শ্রেণি, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস হাই স্কুল, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা